দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

অগ্নিবীর প্রকল্প অত্যন্ত সময়োচিত এক পদক্ষেপ — পৃঃ ১৭

গুরু-শিষ্য পরম্পরা পরম বৈভবশালী ভারতবর্ষের ভিত্তিভূমি — পৃঃ ১১

৭৪ বর্ষ, ৪৪ সংখ্যা।। ১১ জুলাই, ২০২২।। ২৬ আষাঢ় - ১৪২৯।। যুগাব্দ - ৫১২৪।। website : www.eswastika.com

এনডিএ মনোনীত রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী দ্রৌপদী মুর্মু

এক সাধারণ মানুষের অসাধারণ জীবন

CENTURYPLY®

CENTURYPLY® CENTURYLAMINATES® CENTURYVENEERS®

CENTURYPRELAM® CENTURYMDF® CENTURYDOORS™

zykron FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS

STARKE NEW AGE PANELS

SAINIK PLYWOOD HAMESHA TAIYYAR

For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৪ বর্ষ ৪৪ সংখ্যা, ২৬ আষাঢ়, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

১১ জুলাই - ২০২২, যুগাব্দ - ৫১২৪,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

ফঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

রাজনৈতিক লুকোচুরির খেলা বন্ধ করুন 'মেঘনাদ মমতা' ◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

চাকরি চাইতে লজ্জা করে না! ◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী দ্রৌপদী মুর্মু এবং বিজেপির জনজাতি সংযোগ ◻ হিলাল আহমেদ ◻ ৮

মহারাষ্ট্রে ক্ষমতা পরিবর্তন প্রত্যাশিতই ছিল ◻ বিশ্বামিত্র ◻ ১০

গুরু-শিষ্য পরম্পরা পরমবৈভবশালী ভারতবর্ষের ভিত্তিভূমি ◻ পিন্টু সান্যাল ◻ ১১

ষাট কেজি সোনায় মোড়া হলো কাশী বিশ্বনাথ গর্ভমন্দির ◻ দুর্গাপদ ঘোষ ◻ ১৩

রাজ্যের মানুষ দুর্নীতির নায়কদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চায় ◻ সাধন কুমার পাল ◻ ১৫

প্রধানমন্ত্রীর দিশাজ্ঞাপক উন্নয়ন-চিত্র ◻ শেখর সেনগুপ্ত ◻ ১৬

অগ্নিবীর প্রকল্প অত্যন্ত সময়োচিত এক পদক্ষেপ ◻ কর্নেল কুণাল ভট্টাচার্য (অবসরপ্রাপ্ত) ◻ ১৭

সাধারণ মানুষের অসাধারণ জীবন ◻ অভিরূপ গঙ্গোপাধ্যায় ◻ ২৩

সবাইকে সঙ্গে নিয়ে পথ চলার মন্ত্রেই বাজিমাত বিজেপির ◻ নিখিল চিত্রকর ◻ ২৬

কঠ গণরাজ্যের চণ্ডীবাহিনীর হাতে শোচনীয় পরাজয় আলেকজান্ডারের ◻ পৃথ্বীশ সেন ◻ ৩১

শ্রীগুরু পূর্ণিমায় পরম গুরু বেদব্যাসের প্রতিই শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় ◻ বিদ্রোহী কুমার সরকার ◻ ৩৩

লোকমাতা রানি রাসমণির অর্পণনামা এবং ১৫০ বছরের মামলা ◻ সুবল সরদার ◻ ৩৫

হরিয়ানার মেওয়াত জেলার বহু গ্রাম হিন্দুশূন্য ◻ সুদীপ নারায়ণ ঘোষ ◻ ৩৭

রাষ্ট্র জাগরণে সাধু-সন্ন্যাসীদের অবদান ◻ করুণা প্রকাশ ◻ ৪৩

কড়া হাতে দেশের উগ্রপন্থা নির্মূল করার সময় এসেছে ◻ মণীন্দ্রনাথ সাহা ◻ ৪৬

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ◻ অঙ্গনা : ২১ ◻ সুস্বাস্থ্য : ২২ ◻ সমাবেশ সমাচার : ২৮ -৩০ ◻ রঙ্গম : ৩৮ ◻ অন্যরকম : ৩৯ ◻ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ◻ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৮-৪৯ ◻ চিত্রকথা : ৫০

প্রকাশিত হবে
১৮ জুলাই
২০২২

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

প্রকাশিত হবে
১৮ জুলাই
২০২২

রাশিয়ার পেট্রোলে মধ্যপ্রাচ্যের আপত্তি

রাশিয়া থেকে সস্তায় কাঁচা পেট্রোল কিনছে ভারত। এই আমদানি ধাপে ধাপে মোট প্রয়োজনের ৪০ শতাংশে পৌঁছে গেছে। আর তাতেই গোঁসা হয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির। কারণ, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হবার আগে ভারত মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি থেকেই ৮৫ শতাংশ তেল কিনত। তেল কেনা নিয়ে যখন টানাপোড়েন চলছে তারই মধ্যে প্রফেট মহম্মদকে নিয়ে নূপুর শর্মার মন্তব্য ঘিরে বিতর্ক শুরু হয়েছে। রাজস্থানের উদয়পুরে কানহাইয়ালালকে গলা কেটে খুন করেছে জেহাদিরা। অমরাবতীতেও জঙ্গিদের হাতে খুন হয়েছেন উমেশ কোলে। প্রশ্ন হলো, ভারতে এইসব জেহাদি কার্যকলাপের সঙ্গে রাশিয়া থেকে তেল কেনা ও তার জন্য মধ্যপ্রাচ্যের রাগের কোনো সম্পর্ক আছে কি? আগামী সংখ্যায় স্বস্তিকা এই প্রশ্নেরই উত্তর খোঁজার চেষ্টা করবে। লিখবেন— ড. রাজলক্ষ্মী বসু, ভবানী শংকর বাগচী প্রমুখ।

দাম ষোলো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :

INDIAN OVERSEAS BANK

Branch : **Sreemani Market**

Kolkata-700 006

বিশেষ ঘোষণা

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কাজ বাঙ্গলায় গত ১৯৩৯ সাল থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে চলেছে। সেই কাজে বাঙ্গলা তথা ভারতের বহু কার্যকর্তা ও প্রচারকের পরিশ্রম নিহিত আছে। তাঁদের মধ্যে অনেকেই প্রয়াত, অনেকে খুবই বৃদ্ধ। তাই বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে বাঙ্গলার সঙ্ঘকাজের প্রারম্ভিক ইতিহাস তুলে ধরা প্রয়োজন। এই কাজ স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্ট হাতে নিয়েছে। আগামী শুভ জন্মাষ্টমী, ২০২২ তিথিতে **'বাঙ্গলায় সঙ্ঘের কাজের ইতিহাস'** নামক এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হতে চলেছে। সহযোগ রাশি ২৫০্ টাকা। প্রকাশপূর্ব রাশি ১৫০্ টাকা।

ডাকযোগে বইটি নিতে হলে ডাক খরচ বাবদ ৫০্ টাকা অতিরিক্ত লাগবে।

প্রকাশ পূর্ব রাশি দেওয়ার শেষ তারিখ ৩১ জুলাই, ২০২২। জেলা অনুসারে অথবা ব্যক্তিগত ভাবে টাকা পাঠাতে পারেন। সরাসরি টাকা ব্যাংকে পাঠানোর জন্য নীচে ব্যাংকের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হলো। টাকা ব্যাংকে পাঠানোর পর তপন সাহা (মো: ৯৯০৩০০২৯০১) অথবা মহেন্দ্র নারায়ণ দাস (মো : ৯৪৭৭৩৯৯২৯৭)— এই দু'জনের কাউকে অবশ্যই জানাবেন।

বইটি কীভাবে সংগ্রহ করবেন তা লিখে জানাবেন। ডাকযোগে নিতে হলে অতিরিক্ত ৫০্ টাকা ডাকমাশুল পাঠাবেন।

Account Name : **SWASTIK PRAKASHAN TRUST**

A/C. No. : **0954000100121397**

IFS Code : **PUNB0095400**

Bank Name : **PUNJAB NATIONAL BANK**

VIVEKANAND ROAD

Kolkata - 700 006

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

যোগ্যতম প্রার্থী দ্রৌপদী মুর্মু

ভারতের রাষ্ট্রপতি হইলেন ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের সর্বোচ্চ ব্যক্তি। তিনিই ভারতের বিচার বিভাগের সমস্ত শাখার সাম্মানিক প্রধান। তিনি ভারতের সামরিক বাহিনীরও সর্বাধিনায়ক। ভারতীয় বিচার ব্যবস্থায় দণ্ডিত ব্যক্তির দণ্ডাদেশ স্থগিত, মেয়াদ হ্রাস বা প্রাণরক্ষা করিবারও তিনি অধিকারী। এইরূপ সাংবিধানিক সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিকে দেশের রাষ্ট্রপতি হিসাবে নির্বাচিত করিবার পূর্বে তাঁহার প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা এবং নিষ্কলুষ চরিত্রের দিকটিকেও পর্যালোচনা করিতে হয়। ভারতবর্ষের সৌভাগ্য যে দেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করিবার সময় বিধায়ক ও সাংসদগণ এই বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করিয়া থাকেন। ভারতের আসন্ন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে এনডিএ জোট আবার একবার যোগ্যতম ব্যক্তিকেই রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী ঘোষণা করিয়াছে। তিনি হইলেন ওড়িশার দ্রৌপদী মুর্মু। সবচাইতে বড়ো কথা হইল তিনি জনজাতি সমাজ ভুক্ত। বিস্তর রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা তাঁহার রহিয়াছে। চৌষট্টি বৎসরের দ্রৌপদী মুর্মু দীর্ঘদিনের রাজনীতিবিদ। দল পরিচালনা হইতে আইন সভা সর্বত্র বিভিন্ন পদে নানা দায়িত্ব তিনি যোগ্যতার সহিত নির্বাহ করিয়াছেন। পেশায় শিক্ষক হইলেও ১৯৯৭ সালে মানুয়ের উন্নয়নে কাজ করিবার জন্য পঞ্চয়েত স্তর হইতে তিনি রাজনৈতিক জীবন শুরু করিয়াছেন। মানুষের পাশে থাকিয়া মানুষের কাজ করিবার জন্য তিনি সঠিক রাজনৈতিক দলে যোগদান করিয়াছিলেন। ২০০০ ও ২০০৪ সালে বিধানসভা নির্বাচনে জয়লাভ করিয়া বিজেডি- বিজেপি জোট সরকারের মন্ত্রী হইয়াছেন। পরিবহণ, পশুপালন ও মৎস্য দপ্তরের দায়িত্ব যোগ্যতার সহিত পালন করিয়া তিনি যোগ্য নেত্রী হিসাবে ওড়িশার জনমানসে স্থান করিয়া লইয়াছেন।২০০৭ সালে তিনি ওড়িশার সেরা বিধায়ক সম্মানে ভূষিত হইয়াছেন। ২০১৫ হইতে ২০২১ সাল পর্যন্ত তিনি ঝাড়খণ্ডের রাজ্যপাল হিসাবে দায়িত্ব পালন করিয়াছেন। ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ জেলার বৈদাপোসী গ্রামে সাঁওতাল পরিবারে তাঁহার জন্ম। অভাব ছিল নিত্যসঙ্গী। প্রথাগত শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি শিক্ষকতাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। মানুষের কথা ভাবিয়াই তিনি রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করিয়াছেন । রাজনীতি তাঁহার পেশা নহে। সমাজের সেবা, গরিব ও পিছাইয়া পড়া মানুষের উন্নয়নে জীবন উৎসর্গ করা তাঁহার নেশা। ২০০২ হইতে ২০০৯ সাল পার্যন্ত তিনি বিজেপি দলের জনজাতি মোর্চার জাতীয় কর্মসমিতির সদস্য ছিলেন। ২০০৬ হইতে ২০০৯ পর্যন্ত ওড়িশা বিজেপির জনজাতি মোর্চার সভানেত্রীর দায়িত্ব পালন করিয়াছেন। প্রশাসনের কাজের সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যপাল হিসাবেও তাঁর অভিজ্ঞতা রহিয়াছে।

ভারতীয় জনতা পার্টি নারীর ক্ষমতায়নের কথা বলিয়া থাকে। দ্রৌপদী মুর্মুকে রাষ্ট্রপতিপদপ্রার্থী করিয়া তাহা সফল করিবার পাশাপাশি জনজাতি সমাজও যে ভারতীয় জীবনের অভিন্ন অঙ্গ তাহা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কথা ও কাজ যে সমার্থক দ্রৌপদী মুর্মুকে রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী করা তাহারও প্রমাণ দিতেছে। গত ২৮ জুন দ্রৌপদী মুর্মু তাঁরা মনোয়নপত্র বর্তমান রাষ্ট্রপতি সকাশে জমা করিয়াছেন। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী প্রস্তাবক হিসাবে এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংহ সমর্থক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। ষোড়শতম রাষ্ট্রপতি হিসাবে বর্তমান রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের কার্যকাল আগামী ২৪ জুলাই সমাপ্ত হইয়া যাইতেছে। নির্বাচন আগামী ১৮ জুলাই এবং ফল ঘোষণা হইবে ২১ জুলাই। অঙ্কের হিসাবে দ্রৌপদী মুর্মুর পাল্লা ভারী রহিয়াছে। নির্বাচনে জয়লাভ করিলে তিনিই হইবেন ভারতের সপ্তদশতম রাষ্ট্রপতি। তাঁহার জয়লাভে দেশ একজন কৃতী রাষ্ট্রপতি পাইবে। কংগ্রেস আমলে দেশের প্রথম মহিলা রাষ্ট্রপতি হইয়াছিলেন প্রতিভা পাতিল। দ্রৌপদী মুর্মু নারী হইলেও তিনিই প্রথম দেশের জনজাতি সমাজভুক্ত রাষ্ট্রপতি হইবেন। তিনি রাষ্ট্রপতি হইলে নব ভারতের জয়যাত্রা যে যথেষ্ট গতিলাভ করিবে তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই।

সুভাষিতম্

প্রেরকঃ সূচকশ্চৈব বাচকো দর্শকস্তথা।

শিক্ষকো বোধকশ্চৈব ষড়েতে গুরবঃ স্মৃতাঃ।।

প্রেরণাদানকারী, জ্ঞানদানকারী, সত্য ভাষণকারী, পথপ্রদর্শনকারী, শিক্ষাদানকারী এবং বোধদানকারী— এই ছয়জনকে গুরু বলা হয়ে থাকে।

রাজনৈতিক লুকোচুরির খেলা বন্ধ করুন ‘মেঘনাদ মমতা’

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

আড়াল থেকেই তির ছুঁড়তে অভ্যস্ত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সঙ্গে তৈরি করেন রাজনৈতিক ভ্রম আর মরীচিকা। উদ্দেশ্য একটাই, মনোভাব জানতে না দেওয়া। ২১ জুলাই বিজেপির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করবেন, জানিয়েছেন মমতা। আমার ধারণা সেটা রাজনৈতিক মায়া। কিছু সস্তা সমর্থন আদায় করে নেওয়ার জন্য। চাণক্যসূত্র বা নীতি মমতা পড়েছেন বলে আমরা মনে হয় না। তবে বিজেপি আর কংগ্রেস-সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ঘর করে রাজনৈতিক কৌশল রপ্ত করেছেন মমতা। আচার্য চাণক্যের সপ্তাঙ্গ তত্ত্বের অন্তর্গত ‘ইন্দ্রজাল’ তিনি প্রথাগত ভাবে শেখেননি। জানেনও না। ওই তত্ত্বে নিজেকে বাঁচানোর জন্য রাজা তাঁর শত্রু আর মিত্রদের মধ্যে ভ্রম তৈরি করেন। ফলে কেউ তাঁর মনোভাবের নাগাল পায় না। তত্ত্ব না জেনেও মমতা তাই করেন। শুধু বিরোধী বা বন্ধু শিবির নয়, নিজের দলের নেতারাও তাতে হিমশিম খান। এক জাঁদরেল মন্ত্রীর কথায় ‘মমতা সকালে একরকম, দুপুরে একরকম আর বিকেলে অন্যরকম’।

বিজেপি বা এনডিএ অনুমোদিত রাষ্ট্রপতি প্রার্থী দ্রৌপদী মুর্মুকে ঘিরে তাঁর হঠাৎ উলটো গাওনা। দাবি করেছেন মুর্মু প্রার্থী হবেন জানলে বিরোধিতা না করে অন্য কিছু ভাবতেন। সেটা কী বলেননি। এটা একটা ভ্রম তৈরির চেষ্টা। মুর্মু জনজাতির মানুষ ও মহিলা। এ রাজ্যের বিধানসভায় ১৬টি জনজাতি আসন। তার মধ্যে ৯টি আসন আর ৪৫ শতাংশ ভোট তৃণমূলের। বিজেপির ৭টি। সংসদে ৬৭ জনজাতির আসন। এটা সবার জানা মমতা ভাবেন একরকম, বলেন একরকম আর করেন অন্যরকম। তাই অশ্চর্য হবার কিছু নেই। আগেই লিখেছি নির্বাচন ঘিরে মমতার মূল রাজনৈতিক খেলা অন্যকে বিভ্রান্ত করে নিজের মতকে আড়াল করে রাখা। তাঁর দল শেষ পর্যন্ত কাকে ভোট দেবে তা নিয়ে আমার সন্দেহ আছে।

> মূল্যবোধের রাজনীতির কথা বলবেন আর কার্যক্ষেত্রে তার বিপরীত করবেন মমতার এই দ্বিচারিতা বন্ধের প্রয়োজন রয়েছে। ছল-চাতুরি আর লুকোচুরি রাজনীতির অঙ্গ হতে পারে। তবে তা স্বল্পায়ু।

২০১২ সালে প্রণব মুখোপাধ্যায়কে রাষ্ট্রপতি প্রার্থী হিসেবে ভোট না দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করেও শেষ অবধি তাঁকে ভোট দিয়েছিল তৃণমূল। ২০০২ সালে বিজেপি চালিত এনডিএ-র শরিক হয়ে বাম মহিলা প্রার্থী লক্ষ্মী সহগলের বিরোধিতা করেন মমতা। আর ২০০৭ সালে ইউপিএ প্রার্থী প্রতিভা পাটিলকে ভোট দেয়নি তৃণমূল। তাই মহিলা প্রার্থীর প্রতি মমতার সমর্থন নিছক কথার কথা। তাই এটা যেমন ঠিক অন্যটাও ঠিক। মমতা জেনে বুঝে সব কিছু করেন। বন্ধু বা শত্রুকে তা বুঝতে দেন না।

দলীয় সহ-সভাপতি যশবন্ত সিনহাকে প্রার্থী করার আগে মমতা বিলক্ষণ জানতেন দ্রৌপদী মুর্মু বিজেপি প্রার্থী হচ্ছেন। তাঁর দলের নেতার কাছে শুনে আমি অনুমানে লিখেছিলাম বিজেপি দ্রৌপদী মুর্মুকে প্রার্থী করছে। তাঁর নেতারা জানে আর তিনি জানে না তা কখনো হয়? মমতা এই ভাবে সব ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি আর ভ্রম তৈরি করেন। রাজধর্ম পালনের সামর্থ্য মমতার নেই। তাই ‘সাম-দান-দণ্ড-ভেদ আর মায়া-উপেক্ষা-ইন্দ্রজাল’-এর নির্যাস পালনে তিনি যে ব্যর্থ হবেন তা বলার দরকার নেই। সবরকমের বিরোধিতার উপর অহেতুক অত্যাচার তার প্রমাণ।

তাছাড়া তাঁর জাতীয় কমিটির ৪ নেতা দুর্নীতিতে অভিযুক্ত। সাধারণ সম্পাদক ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় রয়েছেন তাদের মধ্যে। অথচ মমতা তাঁদের দলীয় ক্ষমতায় রেখে সামনে থেকে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। এটা ঠিক যে এখন পর্যন্ত এঁরা কেউ দোষী প্রমাণিত হননি। তাহলে নির্দোষ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত মমতা তাঁদের সরিয়ে রাখছেন না কেন? মূল্যবোধের রাজনীতির কথা বলবেন আর কার্যক্ষেত্রে তার বিপরীত করবেন মমতার এই দ্বিচারিতা বন্ধের প্রয়োজন রয়েছে। ছল-চাতুরি আর লুকোচুরি রাজনীতির অঙ্গ হতে পারে। তবে তা স্বল্পায়ু। রামায়ণের মেঘনাদ বধ হয়েছিল বিভীষণের সহায়তায় লক্ষ্মণের হাতে। মমতার ঘরেও তিলে বাড়ছে সে বিভীষণ আর লক্ষ্মণরা। ছল-চাতুরি আর লুকোচুরি করে সেটাও চেপে রাখছেন মমতা। তবে নতুনভাবে তৈরি হতে চলেছে তৃণমূলের ‘মেঘনাদবধ’ কাব্য। □

চাকরি চাইতে লজ্জা করে না!

রেগে অগ্নিশর্মাষু দিদি,

সেদিন দেখলাম আপনার সভায় একদল যুবতী হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে। দাবি, পরীক্ষা-সফল শিক্ষকদের চাকরি চাই। এটা তো প্রথম নয়, আগেও হয়েছে। সেই হিসেবেই বলিছি দিদি, এদের এত চাহিদা কেন? পরীক্ষায় সফল হলেই কি চাকরি পেতে হবে? আর চাকরি নিয়ে যে কত ভোগান্তি হচ্ছে সেটা তো দেখতেই পাচ্ছি। মানছি, আপনার সরকার তথা দলের লোকজন ধরাকে সরা জ্ঞান করে যাকে খুশি চাকরি দিয়েছে। নিয়ম ভাঙতে কোনও কসুর করেনি। কিন্তু তাই বলে আপনি রাজ্যের একজন মুখ্যমন্ত্রী! তাঁর সভায় গিয়ে কি ওইভাবে প্ল্যাকার্ড হাতে দাবি জানানো যায়? আপনি রেগে গিয়েছিলেন। রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে গিয়েছিলেন। ঠিকই করেছিলেন। আজ চাকরি, কাল ডিএ, পরশু অন্য কিছু, এদের চাহিদার কোনও শেষ নেই। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার যখন রয়েছে তখন আবার চাকরিবাকরির কী দরকার? বুঝি না বাপু।

যে দিনের কথা বলছি মানে যে দিন আপনি রেগে গেলেন সেটা কোনও প্রশাসনিক বৈঠক ছিল না। ছিল তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীসভা। তাতেও মঞ্চ থেকে আপনি তৃণমূল সুপ্রিমো দাবি করেছেন যে, এটা সিপিএম, বিজেপির চক্রান্ত। ঠিকই করেছেন। বলেছেন, আপনাদের উকিলকে বলুন আগে মামলা তুলতে, তবেই মিলবে চাকরি। একদম হক কথা। যতই ভুল নিয়োগ হয়ে থাকুক না কেন মামলা করতে কে বলেছে? তৃণমূল আমলে মানছি দলের লোক বা নেতাদের কাছের মানুষেরা চাকরি পেয়েছে কিন্তু তারা তো সবাই বাঙ্গলারই লোক। মানছি, যোগ্যদের বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে তা বলে মামলা করতে হবে নাকি! যাও আদালতে যাও। ববিতা সরকারের মতো মামলা জিতে চাকরি করে নাও। সবেতে আপনার কাছে আসতে হবে কেন? আপনি তো বলেছেনই অনেক চাকরি দিতে গেলে কিছু এরকম হয়েই যায়। যেটা শুনে পার্থদা খানিক স্বস্তি পেয়েছেন। কিন্তু আদালত পায়নি বলেই মনে হচ্ছে। যাই হোক আমি কিন্তু দিদি আপনার সঙ্গেই। কোনও ভাবেই এই চাকরির দাবি জানানোটাকে মেনে নিতে পারছি না। মনে নেওয়ার প্রশ্নই নেই।

শুনলাম সেদিন সভা শেষে মানে আপনার শেষ হওয়ার পরই রীতিমতো ঘাড়ধাক্কা দিয়ে সভাস্থল থেকে বার করে দেওয়া হয় চাকরি চাইতে যাওয়া হবু শিক্ষকদের। তাঁদের অনেকে এসেছিলেন মুর্শিদাবাদ থেকে, কেউ কেউ বর্ধমানের বাসিন্দা। এঁরাই এক বছরেরও বেশি সময় ধরে চাকরির দাবিতে বসে আছেন কলকাতায় গান্ধীমূর্তির নীচে। ওঁদের দাবি একটাই, ঘুষ দিয়ে নয়, পরীক্ষা সফলদের চাকরি দিক সরকার। সেদিন চাকরি চাইতে যাওয়াদের সঙ্গে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতেও বাধা দেওয়া হয়। বাধা দেন সাধারণ পোশাকে থাকা এসএসবি অফিসাররা। ঠিকই তো করেছে দিদি! এটাই তো করা উচিত বলুন!

এখন এটা সবাই জানে যে, আন্দোলনরত শিক্ষক চাকরি প্রার্থীদের হয়ে মামলা লড়ছেন আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য। তিনি সিপিএম সাংসদও বটে। অতীতে কলকাতার মহানাগরিকও ছিলেন। তবে তিনি মামলা লড়ছেন একজন আইনজীবী হিসেবেই। আপনি দিদি, সবাইকে বলেছেন ওঁর কাছে যেতে চাকরি চাওয়ার জন্য। তিনিও আবার ফেসবুক পোস্টে জানিয়েছেন, পরীক্ষা সফলদের চাকরি দেওয়ার ক্ষমতা না থাকলে পদত্যাগ করুন মুখ্যমন্ত্রী। দু' ঘণ্টার মধ্যে ১৭ হাজার শিক্ষক নিয়োগ করব।

কত বড়ো কথা দেখ! পদত্যাগ করো। একদম কান দেবেন না দিদি। কুঁজোরও শখ হয় চিৎ হয়ে শুতে, গামছারও শখ হয় ধোপার বাড়ি যেতে। ঠিক হোক, ভুল হোক চাকরি আপনিই দেবেন। আপনার সরকার। আপনার বাঙ্গলা। আপনি আগা থেকে কাটবেন না গোড়া থেকে কাটবেন সবটাই আপনার সিদ্ধান্ত। □

একদম কান দেবেন না দিদি। কুঁজোরও শখ হয় চিৎ হয়ে শুতে, গামছারও শখ হয় ধোপার বাড়ি যেতে। ঠিক হোক, ভুল হোক চাকরি আপনিই দেবেন। আপনার সরকার। আপনার বাঙ্গলা। আপনি আগা থেকে কাটবেন না গোড়া থেকে কাটবেন সবটাই আপনার সিদ্ধান্ত।

অতিথি কলম

হিলাল আহমেদ

রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী দ্রৌপদী মুর্মু এবং বিজেপির জনজাতি সংযোগ

একটা সহজ সমীকরণ বাজারে চলছে। বিজেপি জনজাতি ভোট পেতে দ্রৌপদী মুর্মুকে সংবিধানের সর্বোচ্চ পদের জন্য মনোনীত করেছে। কেননা তিনি ওড়িশার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে উঠে আসা একজন জনজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ ও নেত্রী। একই সঙ্গে ঝাড়খণ্ডের পূর্বতন রাজ্যপাল। বিজেপির এই মনোনয়নকে পূর্ব পরিকল্পিত রাজনৈতিক ভিত্তি বৃদ্ধির অন্যতম কৌশল হিসেবে মনে করা হচ্ছে। বিশেষ করে অনুসূচিত জনজাতি (সিডিউলড ট্রাইব) সম্প্রদায়ের মধ্যে বাড়তি সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে প্রার্থী নির্বাচন বিজেপির গ্রহণযোগ্যতাকে আরও বাড়িয়ে দেবে। এটাই দলের গরিষ্ঠাংশের অভিমত। বিষয়টা কখনই পূর্ণ সত্য নয়। বিজেপি দীর্ঘদিন থেকেই জনজাতি ভোট পেয়ে আসছে। কিন্তু প্রান্তিক বিশাল জনগোষ্ঠীর মধ্যে দলের রাজনৈতিক অবস্থান ও গ্রহণযোগ্যতাকে আরও মজবুত করতে তাদেরই মধ্য থেকে সর্বোচ্চ পদে এই মনোনয়ন, এমন কখনও হয়নি। যুক্তি দেওয়া হচ্ছে দলের 'সব কা সাথ সব কা বিকাশ' নীতিকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে জনজাতি ভোট পাওয়ার এটি একটি কৌশল মাত্র। এই ধরনের যুক্তিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা যায় না। দলীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা-সহ দলের অন্যান্য প্রবীন নেতারা অনেকেই স্বীকার করেছেন শ্রীমতী মুর্মুর অর্থনৈতিক ভাবে দুর্বল জনজাতি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসেবে পরিচয় অবশ্যই গভীরভাবে বিবেচনায় আনা হয়েছিল।

কিন্তু কেবলমাত্র জনজাতি মন জয় করে তাদের ভোট পেতেই শ্রীমতী মুর্মুকে সর্বোচ্চ পদপ্রার্থী করা হয়েছে এমন সরলীকরণ আদৌ ঠিক নয়। এর কারণ মূলত দুটি। প্রথমত, বিজেপি ইতিমধ্যেই জনজাতিদের কাছে জাতীয় স্তরে প্রথম পছন্দের দল। এই সূত্রে লোকনীতি-সিএমডিএস-এর জাতীয় নির্বাচন ২০১৯-এর ওপর সমীক্ষা অনুযায়ী জনজাতিদের ৪৪ শতাংশ বিজেপিকে ভোট দিয়েছিল। কংগ্রেস এক্ষেত্রে ৩১ শতাংশ জনজাতি ভোট পেতে সক্ষম হয়। লক্ষ রাখতে হবে জনজাতিদের বিজেপির ওপর এমন প্রবল উৎসাহব্যঞ্জক আস্থা কেবল দু-একটি অঞ্চলেই অধিক মাত্রায় সীমাবদ্ধ ছিল এমনটা নয়। দেশের বিভিন্ন রাজ্য স্তরেই জনজাতিদের এককাট্টা সমর্থন ছিল বিজেপির দিকেই।

দ্বিতীয়ত, সাম্প্রতিক নির্বাচনগুলিতে জনজাতিদের ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে বিপুল উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়েছে। পূর্বোল্লেখিত সমীক্ষা অনুযায়ী গত লোকসভা নির্বাচনে তারা ৭২ শতাংশ ভোট দিয়েছিল। জাতীয় গড় ভোটের হার যেখানে ছিল ৬২ শতাংশ। সেখানে জনজাতি সম্প্রদায়ের এই ১০ শতাংশের বেশি হার খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এটা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে তথাকথিত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের বিশ্লেষণ অনুযায়ী জনজাতিরা কখনই মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো নগণ্য অংশগ্রহণকারী মাত্র নন। তাঁরা রাজনীতির একটা প্রভাবশালী অংশীদার। তাঁরা অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে নির্বাচনী ও অন্যান্য রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যোগদান করেন এবং বিজেপি তাদের সঙ্গে থাকতে সদা তৎপর।

এই সূত্রে সর্বোচ্চ পদের জন্য শ্রীমতী মুর্মুকে বেছে নেওয়া বিজেপির জনজাতি রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিন্দুর প্রতি ইঙ্গিত করে।

প্রথমত, বর্তমানে বিজেপি আর আদৌ মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত, শহুরেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হিন্দুদের দল মাত্র নয়। বিগত কয়েক বছরের মধ্যে বিজেপি সর্বার্থেই একটি জাতীয় শক্তিশালী দলে রূপান্তরিত হয়েছে। এবং এই কাজকে সফল করতে দল সমাজের সকল সম্প্রদায় ও শ্রেণীর মধ্যে তার নির্বাচনী ভিত্তি ও বিশ্বাস স্থাপন করেছে। বিভিন্ন সময়ে চালানো নানান ধরনের সমীক্ষায় ধরা পড়েছে বিজেপি সমাজের সর্বাপেক্ষা দুর্দশাগ্রস্ত প্রান্তিক মানুষ যেমন— অতি দলিত, নিম্নবর্গের ওবিসি এবং সর্বাপেক্ষা পিছিয়েপড়া জনজাতিদের দলের আওতায় নিয়ে এসেছে। এই সামগ্রিভাবে পিছিয়ে পড়া বিভিন্ন শ্রেণীকে দল হিন্দুত্বের ছত্রছায়ায় একত্রিত করার নিশ্চিত দাবিদার। কেননা তারা যথাযোগ্য সম্মান ও অধিকার বিজেপির কাছে পেয়েছে। এই সামাজিক প্রয়োগকৌশল দলকে দু'ভাবে সাহায্য করেছে। প্রথমত, এর ফলে বিজেপি নিজেকে সমাজের দুর্বলতম শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। একই সঙ্গে তারা একটি

আদর্শগত সাফল্যও করায়ত্ত করেছে। হিন্দুদের এই একত্রীকরণ মুসলমান সম্প্রদায়ের নজরে পড়ছে। সেই সঙ্গে দলের বিরোধীরাও গোটা বিষয়টা দ্বারা প্রভাবিত হতে বাধ্য হচ্ছে। সেই কারণেই শ্রীমতী মুর্মুর মনোনয়ন এই হিন্দুত্ব ভাবধারা পরিচালিত নিম্নবর্গের রাজনৈতিক উত্থানের একটি সফল প্রতিফলন। এর কর্ণধার বিজেপি।

এই প্রথম বিন্দুটিরই অনুসারী দ্বিতীয়টি। নিম্নবর্গীয় জনজাতিদের ওপর বিজেপির বরাবরের সহমর্মিতা বিদ্যমান। এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ হলো বিগত আট বছরে বিজেপি এটা সফলভাবে প্রমাণ করেছে যে তথাকথিত ইংরেজি বলতে পারা শহুরে উচ্চবর্গীয় সম্প্রদায়, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী যাঁরা খান মার্কেট গ্যাং (দিল্লিস্থিত) নামে প্রসিদ্ধ বা কুখ্যাত তারাই ভারতের গরিষ্ঠাংশ বিপুল সংখ্যক গরিব মানুষদের প্রান্তিক ও প্রায় বর্জনীয় করে রেখেছিল। এই প্রেক্ষাপটে প্রধানমন্ত্রী মোদীর নিজেকে চাওয়ালা এবং জনগণের চৌকিদার হিসেবে পরিচয় দেওয়া যার মধ্যে বড়ো ভাবনা ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রত্যাশা প্রবহমান তা এই সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায় গরিব দ্বৈরথের ক্ষেত্রে নির্ণায়ক ভূমিকা নিয়েছে। বঞ্চিত হয়ে থাকার এই বাস্তব কাহিনির মধ্যে দুটি রাজনৈতিক সুবিধে সন্ধান করে নেওয়া যায়। প্রথমত, এর ফলে পূর্ববর্তী সরকারের গরিবদের জন্য গৃহীত অনেক সিদ্ধান্তকেই অমান্য ও ভুল বলে ঘোষণা করা চলে। উদাহরণস্বরূপ রাহুল গান্ধীকে একটি নির্দিষ্ট পরম্পরার উত্তরাধিকারী হিসেবে 'শাহজাদে' (রাজকুমার) বা নেহরুকে ইংরেজদের ধামাধরা একজন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে চিহ্নিত করা অনেক সহজ হয়ে পড়ে। একই সঙ্গে প্রান্তিক জনজাতি সম্পর্কে ধারণাকে যথাযথ মান্যতা দিলে রাজনৈতিক নানান প্রতিষ্ঠানগুলির চরিত্র ও কাজের অভিমুখ ঠিক করাও প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। উপযুক্ত পরিবর্তন ও পরিমার্জন করাও সহজ হতে পারে। দেশের রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ও কোনো ব্যতিক্রম নয়।

আজকের রাষ্ট্রপতিকে আর রাবার স্ট্যাম্প হিসেবে চালানো চলে না। তিনি আর দেশের সামগ্রিক সামাজিক, রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের মূক সাক্ষী নন। শ্রীমতী মুর্মুর মনোনয়নের মাধ্যমে এই ভাবনাকেই আরও কার্যকরী করতে তাঁর কাছ থেকে সক্রিয় ভূমিকা আশা করা হচ্ছে। কেননা এর দ্বারা জনজাতি ক্ষমতায়নের নীতিকে আরও জনপ্রিয় ও মুর্মুর ব্যক্তিগত পরিচয়ের মাধ্যমে আরও প্রামাণ্য করে তোলা যাবে। এই সূত্রে গত ৩ জুন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ তাঁর জন্মস্থানের গ্রামে একটি ভাষণ দেন। সেটি এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন,'যে মুহূর্তে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আমার মতো একজন হতদরিদ্র গরিব ঘরের প্রান্তিক মানুষকে রাষ্ট্রপতি হওয়ার কথা বলেন তখন আমি আক্ষরিক অর্থেই অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। আমি যে এত বড়ো দায়িত্বের উপযুক্ত হতে পারি আমার জনজাতি উৎসের দরিদ্র পরিবারে জন্ম তা বিশ্বাস করতে দ্বিধান্বিত করে তুলেছিল।' এখানে লক্ষণীয় রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীকে শুধুমাত্র ধন্যবাদই দেননি একইসঙ্গে তিনি গ্রামবাসীদের মধ্যে তাঁর জনজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ হিসেবে এতবড়ো সম্মান পাওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করে তাদের উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।

বিজেপির দীর্ঘ পরিকল্পিত জনজাতি ধাঁচার মধ্যে শ্রীমতী মুর্মু অত্যন্ত যথাযথভাবে খাপ খেয়ে যাচ্ছেন। পরিচয় চিহ্ন হিসেবে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনকেই তিনি পূর্ণ করেছেন। (১) নারী, (২) জনজাতি, (৩) গরিব। এই তিনটি পরিচয় একসূত্রে গ্রথিত হওয়ার ফলে তাঁর সামগ্রিক রূপটি হয়েছে আরও চিত্তাকর্ষক ও অভাবিত যা কোনো দলের পক্ষেই অস্বীকার করা কঠিন। হ্যাঁ, রাষ্ট্রপতিভবনে তাঁর শারীরিক উপস্থিতি তুমুল বিশ্বাসযোগ্যতার সঙ্গে প্রমাণ করবে যে বিজেপি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে সর্বার্থেই গরিব, বঞ্চিত জনজাতি ও প্রান্তিক মানুষদের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছে। এমন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার পরবর্তী সময়ে শ্রীমতী মুর্মুর যথাযথ সক্রিয় ভূমিকা নির্বাহন বিজেপির প্রান্তিক মানুষকে সক্রিয় ও সর্বোচ্চ রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় সংযোজিত করার নীতিকে শক্তিশালী করে তুলবে।

(লেখক নয়াদিল্লির সেন্টার ফর স্টাডিজ অফ ডেভেলপিং সোসাইটির সংযুক্ত অধ্যাপক)

শোকসংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শুভানুধ্যায়ী, স্বস্তিকা পত্রিকার দীর্ঘদিনের লেখক এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাক্তন অভিলেখ্যাগার নির্দেশক প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়ের সহধর্মিণী বন্দিতা চট্টোপাধ্যায় গত ৩ জুলাই পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। তিনি তাঁর স্বামী, ১ কন্যা ও জামাতা রেখে গেছেন।

পাত্র চাই

কলকাতা সল্টলেক নিবাসী WB ব্রাহ্মণ চট্টোপাধ্যায় কাশ্যপ গোত্র পেনশনভোগী অধ্যাপকদ্বয়ের অবিবাহিত সুশ্রী একমাত্র কন্যা প্রায় 40/5' বহুজাতিক সংস্থায় উচ্চপদে চেন্নাইতে কর্মরত বার্ষিক 24+L, জন্ম 03/09/1982, সময় 15.32, স্থান কলকাতা, মকরলগ্ন, কুম্ভরাশি, শতভিষা নক্ষত্র, দেবারিগণ, B Pharm, PGADBM, আমিষ ও নিরামিষ খাদ্যে অভ্যস্ত, এবং শাড়ির তুলনায় ফর্ম্যাল বিদেশি পোশাকে বেশি স্বচ্ছন্দ। বিবাহ পরবর্তী পর্বেও কন্যা চাকরি করবে। অবিবাহিত ব্রাহ্মণ স্বদেশে বা বিদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত, আয় ও শিক্ষায় কন্যার সমতুল পাত্র চাই।
যোগাযোগ : anis.saltlake@gmail.com
Mob. : 9830513598

মহারাষ্ট্রে ক্ষমতা পরিবর্তন প্রত্যাশিতই ছিল

মহারাষ্ট্রের সিংহাসন দখলের লড়াই এখন শুধু সেই রাজ্যেই আবদ্ধ নয়, তা সর্বভারতীয় রাজনীতির বিষয়ও বটে। তবে সর্বভারতীয় মিডিয়া তো বটেই, আন্তর্জাতিক মিডিয়াও এই ঘটনাকে শুধুই ক্ষমতা দখলের রাজনীতি বলে প্রচার করছে। ভারতীয় মিডিয়া আবার পুরো ঘটনাটিকে 'হর্স ট্রেডিং' বা ঘোড়া কেনা-বেচার আওতায় ফেলে ঘটনার অতি সরলীকরণ করছে। কিন্তু ভারতীয় রাজনীতির বর্তমান প্রেক্ষাপটে একে ক্ষমতা দখলের রাজনীতি বললে বিষয়টা কিছুটা গুলিয়ে দেওয়া হয়। খুব সুকৌশলে বিশেষত দেশীয় সংবাদমাধ্যম ঠিক সেটাই করে চলেছে। বিষয়টি একটু খতিয়ে দেখা যাক।

শিবসেনা প্রধান বালাসাহেব ঠাকরে যতদিন বেঁচে ছিলেন, ততদিন তিনি ছিলেন সর্বমান্য একজন নেতা। তিনি নিজে কখনো ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি। কিন্তু আশির দশকের শেষদিক থেকে আমৃত্যু প্রায় পঁচিশ বছর তিনিই মহারাষ্ট্রের রাজনীতির নিয়ন্তা। একটু স্পষ্ট করে বলি, ভারতীয় রাজনীতির ঘরানায় জাতীয়তাবাদী প্রভাবের স্পষ্ট ছাপ তাঁর রাজনীতির মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায়।

ছয়ের দশকে তাঁর প্রতিষ্ঠিত শিবসেনা, যার অর্থ করলে দাঁড়ায় মারাঠা বীর শিবাজীর সৈনিক, যা আজও কংগ্রেসি-কমিউনিস্টদের কাছে উগ্র প্রাদেশিক-সাম্প্রদায়িক দল ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু এই দল শুধু মহারাষ্ট্রের রাজনীতিই নয়, ভারতীয় রাজনীতিরও আমূল পট পরিবর্তন করেছিল।

বালাসাহেবের মূল রাজনৈতিক স্লোগান 'আমচি মুম্বই, মুই মুম্বইকর' অর্থাৎ 'আমাদের মুম্বাই, আমরা মুম্বাইবাসী'-এর মধ্যে যদিও প্রাদেশিকতার গন্ধ ছিল, কিন্তু শিবসেনার মূল লক্ষ্য ছিল মহারাষ্ট্রবাসী তথা ভারতবাসীর আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করা ও তাঁদের জাগরণ ঘটানো। ঠিক যেভাবে শিবাজী স্বধর্ম রক্ষার জন্য মোগলদের বিরুদ্ধে অসম সংগ্রামে গিয়েছিলেন। ঠিক সেই কারণেই মারাঠি নন, এমন অনেক ভারতীয় ব্যক্তিত্বই বালাসাহেবের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছেন। বিশেষ করে, মুম্বাইয়ে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি হওয়ার দরুন অনেক অমারাঠি অভিনেতার প্রতি বালাসাহেব আন্তরিক সহানুভূতিশীল ছিলেন। এমনকী বঙ্গসন্তানরাও তার ব্যতিক্রম নয়। যেমন অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী বালাসাহেবের প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছেন। সব মিলিয়ে এটুকু বলা চলে, বালাসাহেবের শিবসেনার আঞ্চলিক ভিত্তি থাকলেও তা ভারতীয় জাতীয়তাবোধের ধারায় উদ্বুদ্ধ ছিল। ফলে সর্বভারতীয় স্তরে জাতীয়তাবাদী মহাশক্তি হিসেবে বিজেপি যখন আত্মপ্রকাশ করলো, তখন থেকেই শিবসেনা তার 'ন্যাচারাল অ্যালি' বা স্বাভাবিক সহযোগী।

সমস্যা হলো, বালাসাহেবের অবর্তমানে। ২০১৪ সালে বিজেপি কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই। আগেই বলেছি, বালাসাহেবের ক্ষমতার লোভ ছিল না। তিনি নির্বাচনেই কখনও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি। ইতিপূর্বে শিবসেনা যে দু'জন মুখ্যমন্ত্রী পেয়েছিল, মনোহর জোশী ও নারায়ণ রানে, তাঁরা দুজনেই ঠাকরে পরিবারের বাইরে। কিন্তু উদ্ধব তাঁর পিতৃদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পারেননি। মোদী সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই তিনি নিজে ব্যক্তিগতভাবে লালায়িত ছিলেন ক্ষমতার জন্য। যা কোনোদিন হয়নি, ২০১৪ মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনে তাই ঘটলো। বিগত পঁচিশ বছরের ঐতিহ্য, রীতিরেওয়াজ ভেঙে বিধানসভায় আলাদাভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলো শিবসেনা ও বিজেপি। অথচ তার কয়েকদিন আগে লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির জোটসঙ্গী হিসেবেই দারুণ ফল করেছিল উদ্ধবের শিবসেনা। ২০ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ১৮টি আসন পায় তারা। কিন্তু আলাদাভাবে একা লড়ে তাদের ফল খারাপই হলো। ২৮৮ আসনের মধ্যে ২৮৬টিতে লড়ে তারা মাত্র ৬৩টিতে জিতলো। ফলত ভোটের পর কিন্তু সেই বিজেপির হাত ধরতে হলো শিবসেনাকে। ২০১৯-এ বিশ্বাসঘাতকতার চূড়ান্ত দেখা গেল, বিধানসভায় বিজেপির সঙ্গে একসঙ্গে লড়লেও নজিরবিহীনভাবে শুধুমাত্র মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার লোভে উদ্ধব হাত মেলালেন কংগ্রেস-এনসিপির সঙ্গে যাদের বিরুদ্ধেই আজীবন বালাসাহেব ঠাকরে আদর্শগত লড়াই করে এসেছেন। তাদের সেই অনৈতিক জোট মহারাষ্ট্রে ক্ষমতায় এল বটে, উদ্ধব মুখ্যমন্ত্রীও হলেন আর একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে বিরোধী আসনে বসলো বিজেপি।

সুতরাং, একনাথ শিন্ডে এই ২০২২-এর মাঝামাঝি যা করলেন, তা অবশ্যম্ভাবীই ছিল, হয়তো-বা আরও আগেই হওয়া উচিত ছিল। বালাসাহেব দেশে হিন্দুত্বের আন্দোলনের প্রতি দায়বদ্ধ ছিলেন। উদ্ধব পদের মোহে এই আন্দোলনের আদর্শচ্যুত হওয়ায় যে রাজনীতিক ও তাদের তাঁবেদার সংবাদমাধ্যম ভেবেছিল হিন্দুত্বের আদর্শকে দুর্বল করে দেওয়া গিয়েছে ভেবে উল্লসিত, একনাথ শিন্দের বিদ্রোহ তাদের বুকে বড়ো বেজেছে। তাই হর্স ট্রেডিঙের অভিযোগ এনে নজর ঘুরিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা।

মানুষ আদর্শচ্যুত হলে সেই মানুষটির আত্মারও অপমৃত্যু হয়। বালাসাহেব-পুত্র উদ্ধব নিজের জীবন দিয়েই আরও একবার তার প্রমাণ দিয়ে গেলেন। □

শোকসংবাদ

পশ্চিমমেদিনীপুর জেলার মাদপুর খণ্ডের মিতি শাখার স্বয়ংসেবক ড. সুজন সেনের মাতৃদেবী কুসুম কুমারী সেন গত ১ জুন পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭১ বছর। তিনি ১ পুত্র, ১ কন্যা রেখে গেছেন।

গুরু-শিষ্য পরম্পরা পরমবৈভবশালী ভারতবর্ষের ভিত্তিভূমি

পিন্টু সান্যাল

'গুরু' অর্থাৎ যিনি ব্যবহারিক জীবনের শিক্ষার সঙ্গে অন্তর্জগৎকে অন্বেষণের দীক্ষা দেন। কোনো ব্যক্তির জীবনের চলার পথ দেখাতে, জ্ঞানচক্ষু উন্মিলিত করতে যেমন গুরুর ভূমিকা আছে, ঠিক তেমনি একটি রাষ্ট্রের উত্থানেও গুরুর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। ভারতীয় দর্শন চিন্তার ফসল উপনিষদ, যার আক্ষরিক অর্থ হলো যে বিদ্যা নির্জনে গুরুর সমীপে উপবিষ্ট হয়ে গ্রহণ করতে হয়। গুরুর প্রতি সমর্পণের ভাব ভারতবর্ষের শিক্ষা ও সংস্কৃতির আধার। গুরু-শিষ্য পরম্পরাকে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার বললে অত্যুক্তি হবে না।

ভারতীয় গুরুর মুখেই সর্বপ্রথম সর্বমত সমন্বয়ের বাণী 'একম্ সৎ বিপ্রা বহুধা বদন্তি' মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছে। গুরুগৃহে সমস্ত শিষ্যকে সমানভাবে গুরু সেবায় নিয়োজিত থেকে জ্ঞানার্জন করতে হতো। গুরুগৃহের সাম্য পরবর্তীতে সমাজে বিস্তার লাভ করে। কৃষ্ণ-সুদামার বন্ধুত্ব তার অন্যতম উদাহরণ। শাস্তি দেওয়ার, কর্তৃত্ব প্রয়োগের ক্ষমতা তখনই থাকে যখন ভালোবাসার বন্ধন দৃঢ় হয়। গুরুগৃহে সে সুযোগ ছিল। গুরু-শিষ্যের সুর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত একসঙ্গে দীনযাপন সেই বন্ধনের জন্ম দিত যেখানে গুরুর কাছে করা প্রতিজ্ঞা শিষ্য লঙ্ঘন করতে পারতো না। জ্ঞান গ্রহণের আগে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে হতো, কারণ জ্ঞান থেকে শক্তির জন্ম হয়। তাই জ্ঞান দানের আগে যে সংস্কারিত করা প্রয়োজন তা ভারতবর্ষ অনেক আগেই উপলব্ধি করেছিল এবং গুরু পরম্পরার মাধ্যমে তার সুব্যবস্থা করেছিল।

সমাজের নৈতিকতার উৎস ছিল গুরুগৃহ। শিষ্য হতে গেলে যেমন গুরুকে পূজার আসনে বসাতে হবে, গুরুকেও তেমন ত্যাগ, তিতিক্ষা, নিরপেক্ষতা ও জ্ঞানের জীবন্ত রূপ হতে হবে। এই গুরু-শিষ্য পরম্পরাকে ধ্বংস করলে ভারতবর্ষের মেরুদণ্ড যে ভেঙে দেওয়া যায় তা উপলব্ধি করেছিল বৈদেশিক শাসকরা। এল মেকলীয় ব্যবস্থা অর্থাৎ সংস্কারবিহীন সার্টিফিকেটের ব্যবস্থা।

> **"রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ডা. কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার ভারতবর্ষের সনাতন ঐতিহ্যবাহী, তেজোদীপ্ত গৈরিক ধ্বজকে গুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত করে যে ত্যাগব্রতের পথ দেখিয়েছেন তা পরমবৈভবশালী ভারতবর্ষ গঠনের এক অবিকল্প পদ্ধতি।"**

গুরু-শিষ্য পরম্পরাই ভারতবর্ষকে বিপদের সময়ে বারবার উদ্ধার করেছে। ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ ইতিহাস 'ভারতীয় গুরুদের ইতিহাস'- এর মধ্যে পাওয়া যায়। মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্রের জীবনের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সাক্ষী গুরু বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র। ভারতবর্ষে গুরু তাই শুধুমাত্র শিক্ষাজীবনের প্রয়োজন নয়, জীবনে চলার পথে ধ্রুবতারা। মহাভারতে আমরা দেখতে পাই, অর্জুনকে গুরু দ্রোণাচার্য দিয়েছিলেন অস্ত্রশিক্ষা। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে 'গীতা' বোঝালেন অর্জুনের সখা ও গুরু শ্রীকৃষ্ণ— শাস্ত্র ও শস্ত্রশিক্ষা একসঙ্গেই ধর্মের বিজয় সুনিশ্চিত করেছে। বৌদ্ধধর্ম যখন পথভ্রষ্ট হয়ে হীনবল হয়ে পড়েছিল, জগদ্গুরু শঙ্করাচার্য বৈদিক ধর্মকে স্বমহিমায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। আচার্য চাণক্য থেকে ভারতবর্ষ চন্দ্রগুপ্তকে পেয়েছিল যার ফলে ভারতবর্ষ বৈদেশিক আক্রমণের বিরুদ্ধে নিজেকে রক্ষা করতে পেরেছিল।

ভারতীয় গুরুদের ত্যাগ-তিতিক্ষার ফলেই ভারতীয় সংস্কৃতি পুষ্টিলাভ করেছে এবং সমাজ আপন সংস্কৃতি রক্ষার্থে শক্তিলাভ করেছে। ভারতবর্ষের দক্ষিণে হরিহর ও বুক্কা যে বৈভবশালী বিজয়নগর সাম্রাজ্যের সূচনা করেছিলেন তার মূলে ছিল গুরুদেব স্বামী বিদ্যারণ্যের প্রেরণা। ভারতবর্ষকে বিধর্মীদের অত্যাচার থেকে বাঁচাতে গুরু নানক থেকে শুরু করে গুরু গোবিন্দ সিংহের আত্মবলিদান কি আমরা ভুলতে পারি? ভারতবর্ষের সনাতন সংস্কৃতিকে বাঁচাতে গুরু অর্জুনদেব থেকে গুরু তেগবাহাদুরের বলিদান আজও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আমাদের

ফঃ ২

প্রেরণার উৎস। শিখ গুরুদের বলিদান পরবর্তীকালে রঞ্জিত সিংহের মুকুটের কোহিনূর হয়ে শোভা পেয়েছে। সমর্থ স্বামী রামদাস শ্রীনগরে শিখ গুরু হরগোবিন্দের সান্নিধ্যে আসেন। শিখ গুরুর প্রেরণা সমর্থ স্বামী রামদাসের মাধ্যমে মহারাষ্ট্রে পৌঁছায়। গুরু পরম্পরা শিখ থেকে মারাঠা পর্যন্ত এক সুরে ধ্বনিত হয়েছে। মারাঠাকে কেন্দ্র করে 'হিন্দভী স্বরাজ'-এর শঙ্খধ্বনি বাজালেন ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ।

গুরু পরম্পরা পরবর্তীকালে ব্যক্তিনির্ভর না হয়ে তত্ত্বনির্ভর হয়ে ত্রুটির সম্ভাবনাকে লোপ করার প্রয়াস দেখা গেল গুরু গ্রন্থসাহেবের মাধ্যমে। ইংরেজদের শাসনকালে রাজশক্তির আনুকূল্য পাওয়ার চেষ্টায় যুবকদের মনে সনাতন সংস্কৃতির বিরুদ্ধে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের প্রচার হতে লাগলো। সনাতন ভারতবর্ষের জাগরণে শ্রীরামকৃষ্ণের 'যত মত, তত পথ'-এর আদর্শ প্রচার করলেন শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ। তা শুধু ভারতবর্ষে সীমাবদ্ধ থাকলো না, আলোড়িত হলো পাশ্চাত্য জগতও। এর আগে বাঙ্গলায় সুলতানি আমলে নবদ্বীপের টোলে শিক্ষাদানে সীমাবদ্ধ না থেকে হরিনাম সংকীর্তনের মাধ্যমে সমাজকে সঙ্ঘবদ্ধ করতে সচেষ্ট হয়েছেন শ্রীচৈতন্যদেব।

সারা পৃথিবীতে শ্রীচৈতন্যদেবের দেখানো পথে কৃষ্ণভক্তি ছড়ালেন গুরু ভক্তিবেদান্ত সরস্বতী ঠাকুরের শিষ্য অভয়চরণ দে (শ্রীল প্রভুপাদ)। শ্রীল প্রভুপাদ পুঁজিবাদ, বামপন্থার দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভেদ করে কৃষ্ণভক্তি ছড়িয়ে দিলেন আমেরিকা-রাশিয়াতে। প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে বঙ্গদেশ তথা ভারতবর্ষের সনাতন সংস্কৃতিকে বাঁচাতে আবির্ভাব হলো গুরুদেব স্বামী প্রণবানন্দের। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ আজ সত্যিই হিন্দু মিলন মন্দির। ভারতবর্ষের আকাশে যখনই অপসংস্কৃতির কালোমেঘ জমা হয়েছে গুরু পরম্পরা থেকেই সূর্যোদয় ঘটেছে।

ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনা এই সাক্ষ্যই দেয় যে, গুরু-শিষ্য পরম্পরা সনাতন ভারতবর্ষের রোগ প্রতিরোধক ও প্রতিষেধক পদ্ধতি, অর্থাৎ 'ইমিউনিটি সিস্টেম' এবং জ্ঞানবাহী 'স্নায়ুতন্ত্র'। গুরু একদিকে যেমন ব্রহ্মার মতো সৃষ্টি করবেন, বিষ্ণুর মতো পালন করবেন, অন্যদিকে মহেশ্বরের মতোই অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে তাণ্ডবের উদ্বোধন করবেন।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ একাত্মতা স্তোত্রমের মাধ্যমে রাষ্ট্র নির্মাণকারী গুরুদের প্রতিদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। গুরুকুলীয় ব্যবস্থা ভারতবর্ষের জ্ঞানক্ষেত্রকে আবার উর্বর করতে পারে। জ্ঞানকে রক্ষা করতে এবং তার প্রবাহ সঠিক দিকে বজায় রাখতে প্রয়োজন সমাজের সংগঠিত শক্তি। ত্যাগ, জ্ঞান ও শক্তির প্রতীক গুরুর গৈরিক বসন। ঐক্যবদ্ধ হিন্দু সমাজ গঠনের লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ ব্যক্তি পূজার উর্ধ্বে উঠে হিন্দু সমাজের প্রতিটি শাখার কাছে প্রণম্য গৈরিক ধ্বজকেই 'গুরু' রূপে বরণ করেছে।

গৈরিক ধ্বজ হিন্দু আদর্শ, জীবনচর্যা ও রাষ্ট্রহিতে ত্যাগের প্রতীক। সমগ্র হিন্দু সমাজ 'গৈরিক ধ্বজ'কে সসম্মানে উড্ডীন রাখতে বদ্ধপরিকর। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের গুরু গৈরিক ধ্বজের প্রতি সমর্পিত হয়ে রাষ্ট্রের প্রতি ত্যাগে দীক্ষিত, সংস্কারিত ব্যক্তি নির্মাণের অভিনব পদ্ধতি— 'শাখা পদ্ধতি'।

ভারতবর্ষের প্রধান যে দুর্বলতা হিন্দু সমাজের মধ্যেকার অনৈক্য, তা দূর করতে গুরু গৈরিক ধ্বজের ত্যাগ ও শক্তির আদর্শে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ আজ বিশ্বের সর্ববৃহৎ সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক, সনাতন ধর্মের ঐতিহ্যবাহী, সূর্যের তেজোদীপ্ত গৈরিক ধ্বজকে গুরু রূপে গুরুপূর্ণিমার পুণ্যতিথিতে পূজন করে ও গুরুদক্ষিণা সমর্পণ করে।

সঙ্ঘের প্রত্যেক স্বয়ংসেবক সারাবছর ধরে রাষ্ট্রহিতে নিজেদের বিদ্যা, বুদ্ধি, কায়িক শ্রমের প্রয়োগে ক্লান্তিহীন থাকেন। হিন্দুরা যেমন 'গঙ্গা থেকেই জল নিয়ে, সেই জলই দেবতার উদ্দেশ্যে অর্পণ করে, ঠিক তেমনি সমাজ থেকে যে 'অর্থরাশি' আমরা প্রাপ্ত হই, তার কিছু অংশ 'গুরুদক্ষিণা' হিসেবে ভারত মায়ের হাতে শোভাপ্রাপ্ত গুরু 'গৈরিক ধ্বজ'-এর উদ্দেশ্যে প্রতিবছর সমর্পণ করেন প্রত্যেক স্বয়ংসেবক। এই সমর্পণের ভাব উপলব্ধি করতে ঋষি অরবিন্দের ১৯০৫ সালের ৩০ আগস্ট, নিজ স্ত্রী মৃণালিনী দেবীকে (২৪ আগস্টে লেখা পত্রের উত্তরে) লেখা একটি পত্রের কিছু অংশ প্রণিধানযোগ্য—

'আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ভগবান যে গুণ, যে প্রতিভা, যে উচ্চশিক্ষা ও বিদ্যা, যে ধন দিয়াছেন সবই ভগবানের, যাহা পরিবারের ভরণ-পোষণে লাগে আর যাহা নিতান্ত আবশ্যকীয় তাহাই নিজের জন্য খরচ করিবার অধিকার, যাহা বাকি রহিল তাহা ভগবানকে ফেরত দেওয়া উচিত। আমি যদি সবই নিজের জন্য, সুখের জন্য, বিলাসের জন্য খরচ করি, তাহা হইলে আমি চোর। হিন্দুশাস্ত্রে বলে, যে ভগবানের নিকট ধন লইয়া ভগবানকে দেয় না, সে চোর। আমি এতদিন পশুবৃত্তি ও চৌর্যবৃত্তি করিয়া আসিতেছি, ইহা বুঝিতে পারিলাম। বুঝিয়া বড়ো অনুতাপ ও নিজের উপর ঘৃণা হইয়াছে, আর নয়, সে পাপ জন্মের মতো ছাড়িয়া দিলাম।' প্রতিবছর গুরুপূর্ণিমার শুভক্ষণে গুরুদক্ষিণার এই সুযোগ সমাজের কাছে 'ভারতমাতা'র সেবায় অংশীদারিত্বের এক সুবর্ণসুযোগ এনে দেয়।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ডা. কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার ভারতবর্ষের সনাতন ঐতিহ্যবাহী, তেজোদীপ্ত গৈরিক ধ্বজকে গুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত করে যে ত্যাগব্রতের পথ দেখিয়েছেন তা পরমবৈভবশালী ভারতবর্ষ গঠনের এক অবিকল্প পদ্ধতি, যার ফল ইতিমধ্যেই সারাবিশ্ব প্রত্যক্ষ করছে। তাই গুরু পরম্পরার মাধ্যমেই অদূর ভবিষ্যতে ভারতবর্ষ আবার একবার বিশ্বগুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত হবে। □

ষাট কেজি সোনায় মোড়া হলো কাশী বিশ্বনাথ গর্ভমন্দির

দুর্গাপদ ঘোষ

বারাণসীর জ্ঞানবাপী মসজিদের মধ্যে 'শিবলিঙ্গ'-সহ অনেক দেব-দেবীর বিগ্রহ ও হিন্দু চিহ্ন বিরাজমান থাকা নিয়ে যখন বিতর্ক ও মামলা-মোকদ্দমা চলছে অন্যদিকে তখন কাশী বিশ্বনাথ মন্দির দর্শনার্থীদের জন্য অন্তত চার-চারটে সুখবর রয়েছে। এতদিনের মন্দির পরিসরের ব্যাপক সংস্কার সাধন এবং গঙ্গার ঘাট থেকে সরাসরি মন্দির পরিসরে প্রবেশের জন্য অসাধারণ করিডোর, মূল মন্দিরের গর্ভগৃহের ভেতরেও আদ্যপ্রান্ত সোনার চাদরে মুড়ে ফেলা এবং প্রতিদিন সন্ধ্যায় উপস্থিত হওয়া সমস্ত ভক্ত ও দর্শনার্থীদের বাবা বিশ্বনাথের পুজোর প্রসাদ ছাড়াও পর্যাপ্ত পরিমাণে ভোগ প্রাপ্তি। এছাড়া আরও একটা খুব বড়ো সুখবর আছে। কুখ্যাত জমি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে উত্তরপ্রদেশের যোগী সরকার তথা বারাণসী প্রশাসনের এক প্রশংসনীয় পদক্ষেপ করেছে। তার ওপর একটা আগাম খবর হলো, বারাণসী রেল স্টেশন থেকে বিশ্বনাথ মন্দিরের প্রায় দোরগোড়ায় গোদোলিয়া পর্যন্ত রোপওয়ে প্রকল্প। যা সম্পূর্ণ হলে স্থানীয় জনসাধারণ ছাড়াও দেশ-বিদেশের তীর্থযাত্রীরা যানজট এড়িয়ে শহরের একাংশ দেখতে দেখতে ঝোলাপথে সরাসরি বিশ্বনাথ ধাম এবং দশাশ্বমেধ ঘাটের কাছে পৌঁছে যেতে পারবেন। গঙ্গাবক্ষে কিছু ক্রুজের মাধ্যমে কাশীধামে আসা- যাওয়ার ব্যবস্থাও করা হচ্ছে। রোপওয়ে চালু হলে সেটাই হবে ভারতের কোনো শহর বা মহাজনপদের মধ্যে প্রথম ঝুলন্ত রাস্তা।

ইতিমধ্যে অনেকেই জেনেছেন যে গত বছরের (২০২১) ১৩ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নবনির্মিত কাশী বিশ্বনাথ ধাম করিডোরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছেন। কিন্তু ঘটনা হলো সেদিন তিনি গঙ্গার

ললিতাঘাট থেকে সোজাসুজি নবনির্মিত ও সুসজ্জিত তোরণদ্বার দিয়ে নবসংস্কারিত ধামে বা মন্দির পরিসরে প্রবেশের করিডোরের উদ্বোধন করেন। তখন থেকে প্রতিদিন কাতারে কাতারে তীর্থযাত্রী সেখান দিয়ে প্রবেশ ও নির্গমন করছেন। কিন্তু মোট ৯০০ কোটি টাকার এই কেভিডি প্রকল্পের কাজ উদ্বোধনের দিনে পুরোপুরিভাবে সম্পূর্ণ হয়নি। বিশেষ করে অনির্বাণ চিতাগ্নির মণিকর্ণিকা এবং অন্যান্য ঘাটের দিক থেকে প্রবেশের কাজ তখনও সামান্য বাকি ছিল। কাশী বিশ্বনাথ ধাম (কেভিডি) প্রকল্প রূপায়ণের মুখ্য দায়িত্বে থাকা 'শ্রী কাশী বিশ্বনাথ স্পেশাল এরিয়া ডেভেলপমেন্ট বোর্ড' মোট যে ২৩টি নতুন ইমারত নির্মাণ করেছে তার মধ্যে সেদিন পর্যন্ত ১০টির কাজ সম্পূর্ণ হয়েছিল। তবে এখন যে পরিসরকে 'ধাম' বলে অভিহিত করা হচ্ছে তার কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। বাকি ১৩টি ইমারত-সহ সামগ্রিক প্রকল্পের মোটামুটি যে ৩ শতাংশের মতো কাজ চলছিল জুন মাসের মধ্যে তা সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। সেই কাজগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো শারীরিক প্রতিবন্ধী ও বয়স্কদের জন্য 'র‍্যাম্প'। ধাম সংলগ্ন গঙ্গা এবং নয়ন বিমোহন গঙ্গারতি দর্শনের জন্য 'গঙ্গা ভিউ পয়েন্ট' এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুচারু করার জন্য গঙ্গাদ্বারের কাছেই 'সিকিওরিটি বিল্ডিং' নির্মাণ করা।

২০১৭ সালে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীপদে বসেই যোগী আদিত্যনাথ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং তাঁর নিজের এই স্বপ্নের প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেন। যেমন কথা তেমন কাজ। সে বছরের ডিসেম্বর মাসেই প্রাথমিকভাবে ৬০০ কোটি টাকার যোজনা নিয়ে মোট ৩২০টি ঘরবাড়ি অধিগ্রহণের কাজ শুরু করা হয়। এজন্য ব্যয় হয় ৩৯০ কোটি টাকা। আর ১, ১১১ জন বাসিন্দা ও দোকানদারদের সুষ্ঠু পুনর্বাসনে ব্যয় হয় আরও ১০০ কোটি টাকা। অধিগ্রহণ করে ৭০ শতাংশ ঘরবাড়ি ভেঙে ফেলার পর আর কোনো বাধাবিঘ্ন কিংবা আইনি জটিলতা না থাকা সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হবার পর ২০১৯ সালের ৮ মার্চ প্রধানমন্ত্রী কেভিডি প্রকল্পের শিলান্যাস করেন। ঠিক হয়েছিল এই ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের দিন থেকে ৩ বছরের মধ্যে প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করা হবে। তা হয়তো হয়েও যেত। কিন্তু মাস তিনেকের মতো বেশি সময় লেগেছে একটা খুব উল্লেখযোগ্য ও সুখকর কারণে। সেটা হলো মূল মন্দিরের গর্ভগৃহের ভেতরে সম্পূর্ণটা এবং বাইরের নীচের অংশকেও সোনার পাতে মুড়ে ফেলা। মূল প্রকল্পের মধ্যে এটা ছিল না।

প্রসঙ্গত, ১৭৭৭ সালে ইন্দোরের মহারানি অহল্যাবাই হোলকরের হাতে পুনর্নির্মিত এই মন্দিরের বাইরের ওপরের অংশ সোনার পাতে মোড়া হয়েছিল ১৭৮৫-৮৬ সালে। তখন এজন্য এখনকার হিসেবে প্রায় ১,০০০ কেজি সোনা দিয়েছিলেন পঞ্জাব কেশরী মহারাণা রণজিৎ সিংহ। এতদিন সোনায় মোড়া সেই মন্দিরই সবাই অবাক বিস্ময়ে দর্শন করে আসছিলেন। কিন্তু এখন তার গর্ভগৃহের ভিতর, দরজার কাঠামো এবং বাইরের নীচের দিকটাও সোনায় মোড়া হয়েছে। এখন কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের ভেতর-বার যেন সোনালি স্বপ্নের মতো ঝকমক করছে। এতটাই যে তার নয়ন মনোহর রূপ

কেবল কল্পনার চোখে দেখলে বস্তুত কিছুই অনুভব করা যাবে না। আর মন্দির পরিসরের আয়তনও অনেক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সংস্কারের আগে ছিল মাত্র ২ হাজার ৭০০ বর্গফুট। এখন ৫ লক্ষ বর্গফুটের বিশাল পরিসর অপরিমেয় ও স্বর্গীয় সৌন্দর্যে ভরপুর হয়ে মনপ্রাণ যেন ভরিয়ে দিচ্ছে।

এ বছরের ২৭ ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী পুনরায় তাঁর লোকসভা কেন্দ্র বারাণসীতে এসে প্রত্যেক বারের মতো জ্যোতির্লিঙ্গের জলাভিষেক ও পূজার্চনা করতে ঢোকেন। তখন তাঁরও দুচোখ যেন অভিভূত হয়ে যায়। সোনার পাতে মোড়া কারুকার্যখচিত গর্ভগৃহ দর্শন করে পুলকিত বোধ করেন। ততদিনে গর্ভগৃহের ভেতরে আদ্যপ্রান্ত সবটাই সোনায় মোড়ার কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তার ওপর আলোর দ্যুতির প্রতিফলনে ভেতরটাকে যেন ইন্দ্রপুরীর মতো মনে হচ্ছিল। দিল্লিকেন্দ্রিক যে নির্মাণ সংস্থা এই অসাধারণ কাজ করেছে তাদের পক্ষে রাজস্থানের একজন নামকরা বাস্তুকার শ্রীমতী শিবানী মিশ্র জানিয়েছেন যে ভেতরের এই কাজ মোটেই সহজ ছিল না। কারুকার্য খচিত দেওয়ালের গায়ে আগে যে সিন্থেটিক এনামেল পেন্ট লাগানো ছিল, তা প্রথমে তারপিন তেল এবং তুলো দিয়ে খুব সাবধানতার সঙ্গে আস্তে আস্তে ঘষে ঘষে তুলে ফেলা হয়। তারপর নকশার সঙ্গে মিলিয়ে বানানো তামার পাত বসানো হয়। তার স্থায়িত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হবার পর শুরু করা হয় সোনার পরতে মোড়ার কাজ।

মন্দিরের বাইরের দেওয়ালের নীচের দিকেও একইভাবে সোনায় মোড়া হয়েছে। তাতে সোনা লেগেছে ২৩ কেজি। বিশেষ ভাবে খেয়াল রাখতে হয়েছে যাতে পাথরের ওপর কারুকার্যখচিত নকশার সামান্যতমও কোনো ক্ষতি না হয়।

সে তো হলো, কিন্তু মোট এই ৬০ কিলোগ্রাম সোনা পাওয়া গেল কার কাছ থেকে! এ প্রশ্নে যেটুকু জানা গেছে তাহলো ২০২১-এর ১৩ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী যখন কাশী বিশ্বনাথ ধামের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন তখন একজন ব্যবসায়ী ভক্তিবশত নিজের থেকে এগিয়ে এসে মন্দির কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করেন। আজকের বাজারে মাত্র ১০ গ্রাম সোনার দাম যখন অন্তত ৫০ হাজার টাকার মতো তখন এই বিপুল পরিমাণ সোনা 'ভক্তিনিধি' বা শ্রদ্ধার্ঘ্য হিসেবে দান করার বিনয়াবনত আগ্রহ প্রকাশ করেন। সোনা পাবার পর মন্দির কর্তৃপক্ষ বাস্তুকারদের সঙ্গে আলোচনা করে পরিকল্পনা নেন। ঠিক হয় যে গর্ভগৃহের মধ্যে ব্যবহার করা হবে ৩৭ কেজি আর বাইরে দেওয়ালের নীচের দিকের জন্য ব্যবহার করা হবে বাকি ২৩ কেজি।

মন্দির কর্তৃপক্ষের বক্তব্য অনুসারে এখন গঙ্গার দিক থেকে প্রবেশ পথ বা 'গঙ্গাদ্বার'-ই-হলো প্রধান করিডোর। সেখান দিয়ে গত ২০ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি মাত্র ৯ দিনের মধ্যে ১ লক্ষ ৬০ হাজার ২৬৭ জন ভক্তের প্রবেশ ঘটে। মার্চে প্রবেশ করেন ৩ লক্ষ ৮০ হাজার ৩৯৬ জন এবং ৩ লক্ষ ১৩ হাজার ১৪৪ জন দর্শনার্থীর প্রবেশ ঘটে এপ্রিলে। এর বাইরে গোদোলিয়ার দিকের পুরনো গলিপথ দিয়েও প্রচুর পুণ্যার্থীর আগমন ঘটেছে। কর্তৃপক্ষের বক্তব্য মোতাবেক এখন গঙ্গাদ্বার দিয়েই রোজ প্রায় লাখ খানেকের মতো তীর্থযাত্রীর প্রবেশ ঘটছে। আগামী শ্রাবণ মাসে প্রতিদিন তা বেড়ে দ্বিগুণেরও বেশি হতে পারে মনে করছেন তাঁরা।

এখন কাশী বিশ্বনাথ ধামে রোজ বিপুল সংখ্যক ভক্ত সমাগম হয়। গত ১৩ জুন সোমবার থেকে বিকেলের পরে আগমনকারীদের জন্য প্রসাদ ছাড়াও ভোগের ব্যবস্থাও শুরু করা হয়েছে। এজন্য 'অন্নপূর্ণা ভবন' নামে তৈরি হয়েছে রন্ধনশালা। সেই ভবনে যেখানে ভোগ রান্না হচ্ছে সেটা হলো 'ভোগশালা'। উদ্বোধনের দিন দুপুরে ৫১ জন পুরোহিত সমবেত কণ্ঠে মঙ্গলাচারণের মাধ্যমে শুরু করা হয়েছে নবনির্মিত এই ভোগশালায় ভোগ রান্না। এই ভোগশালা তথা অন্নপূর্ণা ভবন নির্মিত হয়েছে কালীক গলিতে, সরস্বতী গেটের কাছে যেখানে তার পাশে নবনির্মিত 'যাত্রী সুবিধা কেন্দ্র' থেকে ভক্তরা সহজেই পৌঁছতে পারবেন। সেখানে সবাইকেই প্রসাদ এবং ভোগ বিতরণ করা হচ্ছে। ভোগশালা ও ভোগ বিতরণের মুখ্য দায়িত্বে আছেন কাশী বিশ্বনাথ মন্দির অছি পরিষদের অন্যতম প্রধান ব্রজভূষণ ওঝা এবং কাশী বিদ্বৎ পরিষদের এক শীর্ষকর্তা অধ্যাপক রামনারায়ণ দ্বিবেদী।

ভোগ সম্পর্কিত আর একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো, জমি-মাফিয়াদের কবল থেকে প্রায় ৩০০ কোটি টাকার সম্পত্তি উদ্ধার করে তার মূল মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া। এ রাজ্যে যোগী তথা বিজেপি সরকার মাফিয়াদের বিরুদ্ধে কী ধরনের কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছেন এটা তার অন্যতম বড়ো উদাহরণ। এই সম্পত্তির মালিকরা ২০৯ বছর ধরে কাশী বিশ্বনাথের জন্য নিত্যদিন ভোগের ব্যবস্থা করে আসছিলেন।

এই বিপুল পরিমাণ সম্পত্তির মধ্যে ৬২ হাজার বর্গফুট এলাকাজুড়ে একটা অতি সুন্দর ফুলের বাগানও আছে। দু' দশক আগে পর্যন্ত ভোগের পাশাপাশি বিশ্বনাথের পুজোর ফুলও সেখান থেকে সরবরাহ করা হতো। কিন্তু ক্ষমতাবান রাজনৈতিক পাণ্ডাদের মদতে সম্পত্তি বেদখল হয়ে যাওয়ার কারণে তা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সম্পত্তির মালিকদের গায়ের জোরে সেখানে ঢুকতে পর্যন্ত দেওয়া হচ্ছিল না। যোগী প্রশাসন গত ৯ মে সমাজবাদী পার্টি (এসপি)-র এক স্থানীয় নেতা আনন্দ মোহন ওরফে 'গুড্ডু ভাইয়া' এবং তার দুই ভাই কৃষ্ণমোহন এবং সঞ্জয় যাদবের খপ্পর থেকে সেই সম্পত্তি মুক্ত করে ফিরিয়ে দিয়েছেন তামিলনাড়ু-কেন্দ্রিক ধর্মীয় সেবামূলক সংস্থা 'শ্রীকাশী নাট্টুক্কোট্টাল নগর সত্রম'-এর হাতে। আনন্দ মোহন ২০১৭ সালে সমাজবাদী পার্টির প্রার্থী হয়ে শিবপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচন লড়েছিলেন।

তামিলনাড়ুর ওই সত্রমের পক্ষ থেকে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল যে, ১৮৯০ সালে তাদের রেজিস্ট্রিকৃত ৬৩ হাজার বর্গফুট জমি ছাড়াও কাশী বিশ্বনাথের পুজোর জন্য 'নন্দনবাগান' নামে ৬০ হাজার বর্গফুটের ফুলের বাগান হাতিয়ে নিয়ে ২০০৩ সাল থেকে বিয়েবাড়ির জন্য লন এবং লজ হিসেবে ভাড়া খাটিয়ে মোটা টাকা লুট হচ্ছিল। সত্রমের কাউকে ঢুকতে পর্যন্ত দিচ্ছিল না। সংস্থার মুখ্য কার্যালয় তামিলনাড়ুর শিবগঙ্গায়। বারাণসীর গোদোলিয়ায় রয়েছে স্থানীয় কার্যালয়। জমি-মাফিয়াদের উত্তরপ্রদেশ মাফিয়া- বিরোধী আইনে অভিযুক্ত করা হয়েছে। যে কোনো সময় গ্রেপ্তার করা হতে পারে বলেও ইঙ্গিত মিলেছে। অন্যদিকে নিজেদের সম্পত্তি ফিরে পাবার পর গত ১৬ জুন সত্রমের কার্যকর্তা ও কর্মীরা সেখানকার মন্দিরে পূজার্চনা ও শুদ্ধিযজ্ঞ করেছেন। □

রাজ্যের মানুষ দুর্নীতির নায়কদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চায়

সাধন কুমার পাল

দুর্নীতির অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। এই অগ্নিকুণ্ডে দাউ দাউ করে জ্বলছে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষিত মেধাবী যুবক-যুবতীদের ভবিষ্যৎ, সেই সঙ্গে এ রাজ্যের সাধারণ মানুষের কপাল। পরীক্ষা নেই। নিয়োগ নেই। বেকারত্ব বাড়ছে। সরকার শুনছে না। মুখ্যমন্ত্রী গুরুত্ব দেন না। লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত যুবক-যুবতীর জীবন বিপর্যস্ত। রাজ্য প্রাথমিক টেট দুর্নীতি ধরা পড়ল। ২৬৯ জন প্রাইমারি শিক্ষকের চাকরি বাতিল করল কলকাতা হাইকোর্ট। বিরাট বড়ো দুর্নীতির অভিযোগ সামনে এসেছে ২০১৪-র প্রাথমিক টেটে। জানানো হয়েছে ২০১৪-র প্রাথমিকে ৪২০০০ নিয়োগ হয়েছিল যার মধ্যে প্রায় ১৭,৫০০ নিয়োগ অবৈধ।

২০১৮ সালে কলেজ সার্ভিস কমিশনের নিয়োগ অস্বচ্ছ, ত্রুটিপূর্ণ, স্বজন পোষণের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে; যার কারণ কম যোগ্যতার প্রার্থীদের নিয়োগ হলেও এমফিল/পিএইচডি প্রার্থীরা মেধাতালিকায় পিছনে স্থান পেয়েছে, নিয়োগ পায়নি। এমনই দাবি বঞ্চিত চাকরি প্রার্থীদের। মহামান্য কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গেল বেঞ্চ, ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ মতো কলেজ সার্ভিস কমিশন এখনও স্কোর সিট প্রকাশ করতে পারেনি। মহামান্য বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতে, 'নিয়োগ অস্বচ্ছতার কোনো স্থান নেই; যদি স্বচ্ছ ভাবে যোগ্যদের নিয়োগ হয়, স্কোর সিট প্রকাশের অসুবিধা থাকার কথা নয়।' সিঙ্গেল বেঞ্চের মতো পশ্চিমবঙ্গ তথ্য কমিশন প্রতিটি বিষয়ে স্কোর সিট প্রকাশের নির্দেশ দিলেও কলেজ সার্ভিস কমিশন স্কোর সিট জনসমক্ষে প্রকাশ করে না; নিয়োগের স্বচ্ছতার সঙ্গে আপোশ করে কমিশন অযোগ্যদের নিয়োগ সম্পন্ন করে মেধাবীদের বঞ্চিত করেছে।

এরপর আবার পশ্চিমবঙ্গের ব্যাংকেও নিয়োগ নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ উঠল। ৭ জুন হাই কোর্টে রাজ্যের একটি কো-অপারেটিভ ব্যাংকের নিয়োগ নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। তমলুক-ঘাটাল সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংকে বিভিন্ন বিভাগে ১৩৪ জন কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে যথাযথ অনুমোদন ছাড়াই।

এবার ডব্লিউবিসিএস (এক্সিকিউটিভ ২০১৬)-র পরীক্ষাতেও নম্বর কেলেঙ্কারির অভিযোগ উঠল। ২০১৬-য় এক প্রার্থী মেইনসে লিখিত পরীক্ষায় আদতে যা নম্বর পেয়েছিলেন বিধিবহির্ভূত ভাবে তাঁকে তার ডবল পাইয়ে দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ উঠেছে। এর জেরে তিনি পার্সোনালিটি টেস্টে বসার সুযোগ পেয়ে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উতরে যান। এই মুহূর্তে তিনি দক্ষিণবঙ্গের একটি জেলায় প্রশাসনিক স্তরে উঁচু পদে আসীন। অভিযোগ, ২০১৭ সালে ডব্লিউবিসিএস একজিকিউটিভ পরীক্ষায় প্রথম হন প্রশান্ত বর্মন। আদালতে হলফনামা দিয়ে পিএসসির তরফে জানানো হয়েছে তিনি প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় মাত্র ১৩ পেয়েছিলেন। যেখানে কাট অফ ১২২। তিনি এখন কালচিনি ব্লকের বিডিও। বিক্ষোভেকারীদের প্রশ্ন প্রিলি পরীক্ষায় ফেল করেও কীভাবে তিনি ডব্লিউবিসিএস এক্সিকিউটিভ অফিসার হয়ে গেলেন?

অভিযোগ, ২০১৮, ২০১৯, ২০২০ সালে নার্সিং ট্রেনিং সম্পূর্ণ করা যুবক-যুবতীদের ইন্টারভিউ নিয়েছে সরকার। কিন্তু তাদের নিয়োগ দেয়নি। কিন্তু ২০২১ সালে যারা প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণ করেছেন তাদের অনেকে চাকরি পেয়েছেন। অভিযোগ, নার্স নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজ্যে ব্যাপক অনিয়ম হয়েছে।

এসএসসি-সহ নিয়োগের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সমস্ত দুর্নীতির ঘটনা সামনে আসছে এই গুলির প্রত্যেকটিই সিপিএম জমানায় শুরু হয়েছিল। সিপিএমের দুর্ভেদ্য সাংগঠনিক বুনটের জন্য সেগুলি সামনে আসতে পারেনি। যে সমস্ত আমলার মাধ্যমে বাম জমানায় নিয়োগের অসাধু চক্র সংগঠিত হতো সেই আমলারাই বর্তমান ক্ষমতাসীন নেতাদের দুর্নীতির লোভনীয় সোনার খনির পথ দেখিয়েছে। বর্তমান ক্ষমতাসীন দলের সাংগঠনিক বুনট ও শৃঙ্খলা কোনোটাই নেই। ফলে এই দুর্নীতি একদিকে যেমন লাগামছাড়া ঠিক তেমনি গোপনীয়তার আড়াল আর থাকছে না। সিপিএম দল চালাবার জন্য চাঁদা তুলত। বর্তমান ক্ষমতাসীন দল চাঁদা তোলে না, দল চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় খরচ সংগ্রহ করে বিভিন্ন বিভাগে নিয়োগ, বিভিন্ন কাজের জন্য ঠিকাদারি কমিশন, জনকল্যাণমূলক বরাদ্দ থেকে কাটমানির মতো আয় থেকে। এই সমস্ত উৎস ছাড়াও এখন গোরু পাচার, কয়লা খাদান, বালি পাথরের ব্যবসা এগুলো সবই এখন 'সোনার খনিতে' পরিণত হয়েছে।

এরকম পরিস্থিতিতে সমস্ত ব্যবস্থা যে দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। এর কিছু তদন্তে সিবিআইকে দায়িত্ব দিয়েছে হাইকোর্ট। এরই মধ্যে হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগ খতিয়ে দেখতে প্রায় সব ক্ষেত্রেই তদন্তের দায়িত্ব তুলে দিলেন সিবিআইয়ের হাতে। এমনকী, নিয়োগ দুর্নীতির সেই ঘটনায় ভূতপূর্ব পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের নামও জড়িয়েছে। শিক্ষামহলের একাংশের বক্তব্য, নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে টানাপোড়েনেই দীর্ঘদিন স্কুলে নিয়োগ কার্যত বন্ধ। তাতে শিক্ষক কমেছে বহু স্কুলে। বস্তুত, দুটি বিষয়কে আলাদা করা কঠিন। তার সঙ্গে যোগ হয়েছে নতুন সরকারের 'উৎসশ্রী' প্রকল্পে শিক্ষকদের বাড়ির কাছে বদলির বিষয়টি। তৃতীয় দফায় ক্ষমতায় এসে রাজ্যের স্কুল শিক্ষকদের জন্য 'উৎসশ্রী' প্রকল্পটি ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এর মাধ্যমে শিক্ষকরা চাইলে নিজের জেলায় বাড়ির কাছে বদলির আবেদন করতে পারেন। বদলি প্রক্রিয়াতেও দুর্নীতি ঢুকে পড়েছে। □

প্রধানমন্ত্রীর দিশাজ্ঞাপক উন্নয়ন-চিত্র

শেখর সেনগুপ্ত

সংসদে, মাঠে-ময়দানে বিরোধী দলগুলির নেতা-নেত্রীরা সযত্নে রচিত বাক্যের জাঁতাকলে দেশের প্রধানমন্ত্রীকে যতই বিপন্ন করবার প্রয়াসে গাঢ় দলবদ্ধ হবার চেষ্টা চালিয়ে যান না কেন, তাঁদের সেই প্রয়াস প্রায়শ নস্যাৎ হয়ে যায়, যখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর মোদী একটির পর একটি উন্নয়নমূলক প্রকল্প তথা কর্মকাণ্ডের নিয়মমাফিক পরিচালনা ও সাফল্যের নিখুঁত বিবরণ পেশ করতে থাকেন উদাহরণ ও পরিসংখ্যা সমেত। বিরোধীদের সমবেত স্বর নিঝুম হয়ে আসে তখন। কেন্দ্রীয় সরকারের সকল সফল উদ্যোগের বিবরণ পেশ করবার অবকাশ এই মুহূর্তে আমার না থাকায় আমি এখানে মাত্র বারোটি প্রকৃত উন্নয়নের অতিসংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করলাম 'স্বস্তিকা'র পাঠকদের অবগতির জন্য। তথ্য নিখাদ, অতিরঞ্জন নাস্তি, নেই গাছাড়া মনোভাবও :

১। আমাদের দেশের অধিকাংশ নর-নারীর আবাস-নিবাস এবং দিনাতিপাত গ্রামাঞ্চলে। হিসেব কষে দেখা গিয়েছে মোট নাগরিকের বাষট্টি শতাংশই হলেন তাঁরা। তাঁদের জীবনযুদ্ধে বহুবিধ সমস্যার উপস্থিতি। সেই সকল প্রতিবন্ধকতার অন্যতম হলো--- চিকিৎসালাভের পরিকাঠামোর এমনই দুর্বলতা যে এতকাল ক্ষমতাসীন কোনও সরকারই তার সমাধানে তেমন নড়েচড়ে বসেনি। সাযুজ্যে দশ শতাংশ গ্রামেও আধুনিক স্বাস্থ্যপরিষেবা লভ্য ছিল না। এই হতবাক করে দেওয়া খামতি দূর করতে যে প্রধানমন্ত্রী প্রথম উদ্যোগী হলেন, তিনি নরেন্দ্র মোদী। তাঁর উদ্যোগে ও উদ্যমে যে প্রকল্পগুলি বহুলাংশে সমাপ্ত অথবা সমাপ্তপ্রায়, সেগুলি হলো—

(ক) তিনটি লোকসভা কেন্দ্রপিছু একটি করে মেডিক্যাল কলেজের প্রতিষ্ঠা মুখ্যত গ্রামাঞ্চলের মেধাবী ছাত্রদের সুলভে ডাক্তারি পড়বার সুযোগ করে দিতে।

(খ) গ্রামাঞ্চলে অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক কার্যকলাপকে অনেকটাই বাস্তবায়িত করা।

(গ) গ্রামাঞ্চলে এ যাবৎ ১ লক্ষ ২৫ হাজার কিলোমিটার রাস্তা পাকা ও মজবুত করা।

(ঘ) গ্রামাঞ্চলে এ যাবৎ ২ কোটি গৃহহীনরা মাথা গুঁজতে পারছেন কেন্দ্রীয় সরকার নির্মিত পাকা নিবাসগুলিতে।

২। বাবাসাহেব আম্বেদকারের পরিকল্পিত, সুচিন্তিত, নিজের হাতে লেখা সংবিধানের বয়স যখন ৭৩ বছর অতিক্রম করতে চলেছে, তখন সরকারের মুখ্য লক্ষ্য হলো, সংবিধানের নির্দেশ মোতাবেক সমাজব্যবস্থায় সাম্য এবং পারস্পরিক সহযোগিতার আবহকে ক্রমেই উন্নতস্তরে নিয়ে আসা। মোদীজী তা করছেন।

৩। ভারতের তিন দিকে সমুদ্রের আছাড়ি-পিছাড়ি। সমুদ্রপথে আমদানি-রপ্তানিকারক দেশরূপে ভারতের গুরুত্ব বিশ্ববাজারে অনেকটাই এখন বৃদ্ধি পেয়েছে। আরও বৃদ্ধি ঘটাতে সরকারি প্রয়াস ম্যাজিক না দেখালেও যত্নবান নিঃসন্দেহে।

৪। ব্যাপক প্রচারের কল্যাণে ভারতে প্লাস্টিকের ব্যবহার ধীরে ধীরে কমছে। প্লাস্টিক যে একটি ক্ষতিকারক বস্তু এই বিষয়ে সাধারণ মানুষের বোধ বেড়েছে, ধন্দ কমছে।

৫। ডিজিটাল পেমেন্ট প্ল্যাটফর্মগুলিকে পূর্বাপেক্ষা অধিক সক্রিয় করা গেলেও এই বিষয়ে সরকারি প্রয়াসকে আরও ব্যাপক করবার জন্য নরেন্দ্র মোদী জোর দিয়ে চলেছেন। এটা যুগের দাবি, যেখানে অলীক ব্যাপার কিছু নেই।

৬। ব্যাপক প্রচার ও সরকারি তৎপরতায় ভারতের দূর-দূর গ্রামাঞ্চল এবং বনাঞ্চলও বর্তমানে শৌচমুক্ত এলাকায় রূপান্তরিত, যে পরিকল্পনা পূর্ববর্তী কোনও সরকারের আমলে আমরা শুনিনি, দেখিনি।

৭। আন্তর্জাতিক স্তরে পেট্রল ও পেট্রলজাত বস্তুর অভাবনীয় মূল্যবৃদ্ধি যখন আমাদের প্রতিবেশী দেশ কয়েকটির অর্থনীতিকে প্রায় জীবন্মৃত অবস্থায় টেনে আনছে, তখন ভারতের আর্থিক বুনিয়াদকে কিন্তু বর্তমান বিজেপি সরকার পূর্বাপেক্ষা পোক্ত অবস্থাতেই রাখতে সমর্থ হয়েছে। এই সত্যকে মেনে নিতে কোনও রাখঢাকের অবকাশ আছে বলে আমি মনে করি না।

৮। সন্ত্রাসনির্ভর শক্তিগুলিই এই দেশের নাগরিকদের পক্ষে পরমতম শত্রু। কাশ্মীর-সহ ভারতের ইতিউতি ইত্যাকার একাধিক গোষ্ঠীর প্রায়শ নানান অজুহাতে ধ্বংসাত্মক রক্তক্ষয়ী ঘটনা ঘটে। নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকার যথাসাধ্য চেষ্টা করে চলেছে সেই সকল সন্ত্রাসবাদীকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে। সরকারকে এই কাজে সাময়িকভাবে যদি কঠোর ও নিষ্ঠুর হতে হয়, দেশের মানুষ তা মেনে নেবেন বলেই প্রত্যয়। এমত প্রক্রিয়ার বাস্তবায়নের দিকে বর্তমান সরকার অগ্রসর হচ্ছে দ্রুততার সঙ্গে।

৯। ক্রেতা ও উপভোক্তারা যেন ক্রমে ক্রমে বুঝতে শেখেন যে, এই দেশে নির্মিত দ্রব্যাদির মান ভিনদেশী বস্তুর তুলনায় হেয় নয়।

(১০) কৃষিকর্মে রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার ১০ থেকে ২৫ শতাংশ কমিয়ে আনতে হবে— প্রধানমন্ত্রীর অন্যতম নিশানা এটি।

১১। এ দেশের আর্থিক বুনিয়াদ প্রতিদিন শক্তি সংগ্রহ করছে। তবুও নাগরিকরা যাতে অতিরিক্ত কামনায় দগ্ধ হয়ে বেহিসেবি জীবনযাত্রার দিকে ছুটে না যান, তা নিরসনে কেন্দ্রের বিত্তদপ্তর আরও পারদর্শিতা দেখাতে বদ্ধপরিকর।

১২। ভারতে কৃষিনির্ভর জনতার স্বার্থে গ্রামীণ কৃষিবাজার এবং জাতীয় বৈদ্যুতিন কৃষিবাজার এই দুই প্রকল্পের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। □

অগ্নিবীর প্রকল্প অত্যন্ত সময়োচিত এক পদক্ষেপ

কর্নেল কুণাল ভট্টাচার্য (অবসর প্রাপ্ত)

এটি বিজেপির বিষয় নয়। অগ্নিবীর বিজেপির আলোচ্য বিষয়সূচিও নয়। এটা কখনোই সংসদ বা বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রাক-নির্বাচনী প্রচারের অংশও ছিল না। এই অবসরপ্রাপ্ত জওয়ানদের আরএসএস-এ নিয়োগ করা অবশ্যই আরএসএসের উদ্দেশ্য নয়। এটি সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় প্রতিরক্ষা দপ্তরের সিদ্ধান্ত।

ভারতীয় সেনাবাহিনী হলো স্বেচ্ছাসেবক সেনাবাহিনী। ভারতের অগ্নিবীর ইজরায়েল, জাপান, সিঙ্গাপুর, জার্মানি, চীন, রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইত্যাদি দেশের মতো বাধ্যতামূলক সামরিক প্রশিক্ষণের অংশ নয়। তাই যদি কেউ এই চাকরির ধারণা ও শর্ত পছন্দ না করেন তবে চাকরিতে যোগদানের প্রয়োজন নেই।

সেনাবাহিনী বেকার যুবকদের জন্য একটি কর্মসংস্থান সংস্থা নয়। সেনাবাহিনী কোনো চাকরি নয় এবং এটা স্বাভাবিক দায়িত্বের বাইরে। দেশের জন্যে কাজ করার জন্য একটি সম্পূর্ণ অন্য মানসিকতার প্রয়োজন। সেনাবাহিনীতে যোগদানের জন্য কঠোর নিয়ম রয়েছে যেমন উচ্চতা, ওজন, বুকের মাপ, চোখের দৃষ্টি, শারীরিক সক্ষমতা এবং অন্যান্য যোগ্যতা। যদি কেউ এই মানদণ্ড পূরণ করতে না পারেন, তবে তারা প্রতিরক্ষা বাহিনীতে ভর্তির যোগ্য হবেন না। যদি পর্যাপ্ত সংখ্যক লোক পাওয়া না যায়, তাহলে আসন/পদ শূন্য থাকবে।

মাত্র ৪ বছরের চাকরির পরে বিশ্বের কোথাও পেনশন দেওয়া হয় না। তাই অগ্নিবীরদের পেনশন নিয়ে বিরোধী দলের যুক্তি গ্রহণ যোগ্য নয়। শুধুমাত্র ভারতে বিধায়ক ও সাংসদরা বিধানসভা ও সংসদে মাত্র ৫ বছর কাজ করার পরে আজীবন পেনশন পান। সমস্ত রাজনৈতিক দলের উচিত বিধায়ক ও সাংসদের জন্য এই পেনশন প্রত্যাহারের দাবি জানানো।

স্থায়ী জওয়ানদের জন্য আরও ভালো পদোন্নতির সম্ভাবনা। যেহেতু সেনাবাহিনীর খুব উচ্চ পদোন্নতির সম্ভাবনা অনেক কম। কারণ পদোন্নতি কঠিন পিরামিডের মতো। অনেক জওয়ান আছেন যারা ১৮-২০ বছরের চাকরির পুরো জীবনে শুধুমাত্র একটি পদোন্নতি পেয়েছেন। ১০ জনের একটি বিভাগে, একজন কমান্ডার, তিনি নায়েক। ৩টি সেকশনে একজন প্লাটুন কমান্ডার, তিনি হাবিলদার। সুতরাং ৩০ জন জওয়ানের মধ্যে মাত্র একজন হাবিলদার পদে পৌঁছানোর সম্ভাবনা রয়েছে। বেশিরভাগ জওয়ান সেনাবাহিনী থেকে NK বা Hav হিসেবে অবসর নেন। যেহেতু এখন সেনাবাহিনীতে মাত্র ২৫ শতাংশ লোক রাখা হবে, তাই জওয়ানদের আরও ভালো উন্নতির সম্ভাবনা থাকবে। এই জওয়ানদের বেশিরভাগই হাবিলদার বা জেসিও হিসেবে অবসর নেবেন।

শর্ট সার্ভিস কমিশনড অফিসারদের (এসএসসি) বিশেষ ট্রেনিঙের ব্যবস্থা রয়েছে। ১৯৬২ সালে চীন আক্রমণের পর ১৯৬৩ সাল থেকে ইমার্জেন্সি সার্ভিস অফিসারদের সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করা হয়েছিল। ১৯৬৭-৬৮ সালে তাদের কোনো প্রকার মূল্যবান সুবিধা ছাড়াই সেনাবাহিনী থেকে অবসর নিতে হয়েছিল। তারপর শুরু হলো 'শর্ট সার্ভিস কমিশন অফিসার' (এসএসসি)। এই অফিসারদের প্রশিক্ষণের জন্য চেন্নাইয়ে আলাদা ট্রেনিং ইনস্টিটিউট

রয়েছে। সমস্ত ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর মহিলা অফিসার যাঁরা গত ২০ বছর ধরে নিযুক্ত হয়েছেন তাঁরাও এই প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। আগে তাঁদের ৫ বছর পর অবসর নিতে হতো এবং এখন তাঁরা পেনশন, চিকিৎসা সুবিধা এবং ক্যান্টিন সুবিধার মতো কোনও উল্লেখযোগ্য সুবিধা ছাড়াই ১০ বছর পর্যন্ত কাজ করেন। এই অফিসারদের নিয়োগ নিয়ে কোনো সমস্যা ছিল না এবং কোনো রাজনৈতিক দল কখনোই এই শ্রেণীর অফিসারদের নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিল না। প্রস্তাবিত অগ্নিবীররা এক ধরনের 'শর্ট সার্ভিস কমিশনড জওয়ান'। এটি কোনো নতুন প্রক্রিয়া নয়। প্রতিরক্ষা বাহিনীতে একাধিক প্রবেশ এবং প্রস্থান পয়েন্ট রয়েছে। সেনাবাহিনীতে যোগদানের পর অনেক লোক আছেন যাঁরা কিছুদিন কাজ করার পর নিরাশ হয়ে পড়েন বা অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েন। অনেক ঘরোয়া সমস্যার কারণেও তাঁরা সেনাবাহিনী ছাড়তে চান। আগে স্থায়ী জওয়ানদের সেনাবাহিনী ছেড়ে যাওয়ার অনুমতি ছিল না। এখন ৪ বছর পর সেনাবাহিনী ছাড়ার বিকল্প থাকবে। প্রাইভেট কোম্পানি বা সফ্‌টয়্যার শিল্পেও দেখা যায় লোকেরা ৩ থেকে ৪ বছর পরে সংস্থা বদলাতে চায়।

কমিউনিস্ট ক্ষমতার যুগে ২০০৪ সালে পশ্চিমবঙ্গে পেনশন বন্ধ করা হয়েছিল। সেই সময়ে কংগ্রেস বা টিএমসি কেউই এই পদক্ষেপগুলির বিরুদ্ধে কোনও আন্দোলন করেনি। তাদের দ্বারা ট্রাম, বাস, ট্রেন পোড়ানো হয়নি। ২০১১ সালে তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর তারাও এই পেনশন চালু করেনি। তাহলে যে পরিকল্পনা এখনও কার্যকর হয়নি, সেই পরিকল্পনার জন্য কান্নাকাটি ও রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি নষ্ট করা কেন?

সন্দেহ করা হচ্ছে, অবসরপ্রাপ্ত সেনা সন্ত্রাসী দলে যোগদান করবেন। প্রতি বছর সেনাবাহিনী থেকে ৪০ হাজার থেকে ৫০ হাজার লোক অবসর নেয়। এই বন্দুক চালানো শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকেরা কেউই সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীতে যোগদান করেন না বা ভোট লুটপাট ও গুণ্ডামি করার জন্য কোনো দলে যোগ দেন না। বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য অনাকাঙ্ক্ষিত।

জরুরি পরিস্থিতিতে প্রশিক্ষিত রিজার্ভের বিশাল সংখ্যা। প্রকৃতপক্ষে এই ৭৫ শতাংশ প্রশিক্ষিত অগ্নিবীররা ভবিষ্যতে যে কোনো জরুরি পরিস্থিতির সময় সংরক্ষিত ভারতীয় সেনাবাহিনীর অংশ হিসেবে তৈরি থাকবে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গোষ্ঠী বা যে কোনো উপযুক্ত চাকরিতে রাজ্য সরকারের মাধ্যমে এদের ভালোভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এই প্রকল্প চালু হলে আগামী ৩০ থেকে ৫০ বছর পর আমাদের দেশে কী হতে পারে? গ্রামে, গঞ্জে, শহরে, নগরের অলিতে গলিতে তখন শত শত সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মানুষ থাকবে। যারা বিদেশি শক্তি, অভ্যন্তরীণ শত্রু, দেশদ্রোহী, জঙ্গি, সন্ত্রাসবাদী, দাঙ্গাবাহিনী, টুকড়ে টুকড়ে গ্যাং, ডাকাতদল ইত্যাদির হাত থেকে সমাজকে রক্ষার জন্য অনেকটাই প্রস্তুত ও উপযুক্ত হয়ে উঠবে।

এই প্রারম্ভিক অবসরপ্রাপ্ত অগ্নিবীরদের জন্য চাকরির সংরক্ষণ রয়েছে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (বিএসএফ), সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (সিআরপিএফ), অসম রাইফেলস, সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স (সিআইএসএফ), ইন্দো-তিব্বত বর্ডার পুলিশ (আইটিবিপি), জেনারেল রিজার্ভ ইঞ্জিনিয়ারিং ফোর্স (ডিআরইএফ), বর্ডার রোডস, ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্ডস (এনএসজি), স্পেশাল প্রোটেকশন গ্রুপ (এসপিজি), সশস্ত্র সীমা বল (এসএসবি) প্রভৃতি ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই এই অগ্নিবীরদের জন্য চাকরির সংরক্ষণ অনুমোদন করেছে।

এটি কোনো তাড়াহুড়ো করা সিদ্ধান্ত নয়। প্রথমে এই স্কিমটি ১৯৮৪ সালে সেনা বিশেষজ্ঞ কমিটি দ্বারা উত্থাপিত হয়েছিল। শ্রীলঙ্কায় গৃহযুদ্ধের পরে (১৯৮৯ সালে) এবং আবার কারগিল যুদ্ধের পরে (১৯৯৯ সালে) এবং পরবর্তীকালে সেনাবাহিনীতে ক্রমাগত এই ব্যাপারে ভাবনা চিন্তা হয়েছে। কিন্তু পরবর্তী সরকার এই ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। এই প্রতিবেদকের কোর্সমেট জেনারেল বিপিন রাওয়াত আমাদের কোর্স হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে এই স্কিমটি জানিয়েছিলেন এবং পরামর্শ চেয়েছিলেন। সুতরাং এটি কোনো হঠাৎ নেওয়া সিদ্ধান্ত নয়।

অগ্নিবীরের জন্য ৬ মাসের প্রশিক্ষণই যথেষ্ট। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যুবকদেরকে বর্মা অভিযানে প্রকৃত যুদ্ধের জন্য ৪ সপ্তাহ থেকে ৪ মাস প্রশিক্ষণের পর খড়কি (পুনের কাছে) ও ব্যারাকপুর (পশ্চিমবঙ্গ) থেকে পাঠানো হয়েছিল। তাই এই প্রতিবেদকের মতে শান্তির সময়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীর জন্য ৬ মাসের প্রশিক্ষণই যথেষ্ট।

১৪. জেনারেশন জেড বা মিলেনিয়াম প্রজন্মের তরুণদের জন্য এই প্রকল্প। যারা ২০০০ সালের পরে জন্মগ্রহণ করেছেন, হাতে স্মার্ট ফোন ও কম্পিউটার নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন তারা বর্তমানে ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীতে অত্যন্ত প্রযুক্তিগত ও পরিশীলিত যুদ্ধ পরিস্থিতির জন্য আশীর্বাদ স্বরূপ। এটি অল্প বয়সে একটি খুব ভালো আর্থিক প্যাকেজ। অগ্নিবীর স্কিম দ্বারা প্রস্তাবিত আর্থিক প্যাকেজ কোনও ভারতীয় সংস্থা শুধুমাত্র উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করা তরুণদের এই পরিমাণ অর্থ প্রদান করতে পারে না। কুড়ি বছরের ঊর্ধ্বে এই তরুণদের জন্য ১১.৭৫ লক্ষ টাকা অত্যন্ত আকর্ষণীয়।

অগ্নিবীরদের মৃত্যু বিমা ও অক্ষমতা পেনশন স্থায়ী সৈনিকদের সমান হারে। ছুটি, চিকিৎসা, ক্যান্টিন ও ভ্রমণ ভাতা-সহ অন্যান্য সুবিধা স্থায়ী সৈনিকের সমান। প্রতিরক্ষা বাহিনীতে কাজ করার সময় তাদের হাই অল্টিচিউড, সিয়াচেন ভাতা, জঙ্গল ভাতা এবং সাবমেরিন ভাতা সাধারণ সৈনিকদের মতো এক হারে দেওয়া হবে। অক্ষমতার জন্য শতাংশ অনুযায়ী আজীবন অক্ষমতা ভাতা প্রদান করা হবে। কাজ করার সময়ে মৃত্যু হলে পরিবারকে ১ কোটি টাকা ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থা থাকবে। অগ্নিবীরদের জন্য রাজ্যের সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। তাঁদের বিশেষ সংরক্ষণের জন্য বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা ইতিবাচক পদক্ষেপ। রাজ্যের সরকারি চাকরিতে রিজার্ভেশন থাকা উচিত এবং রাজ্যে বিশেষ পদ তৈরি করা হবে এটি অত্যন্ত ভালো পদক্ষেপ যা পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব সৈনিক সেবা পরিষদের সভাপতি হিসেবে এই প্রতিবেদক অকুণ্ঠ সমর্থন করছে।

(লেখক পূর্ব সৈনিক সেবা পরিষদের রাজ্য সভাপতি)

দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রেক্ষাপটে ধর্মনিরপেক্ষতা

ভারত প্রাচীনতম হিন্দু ধর্মের দেশ। হিন্দু বা সনাতন ধর্মাবলম্বীদের কোনো সংবিধান ছিল না। হিন্দু ম্যারেজ ও সাকসেশন অ্যাক্টে বলা হয়েছে, যাঁরা মুসলমান, খ্রিস্টান, পার্শি অথবা ইহুদি নন তাঁরই হিন্দু। এখানে তারা শান্তিপূর্ণ ভাবে বসবাস করে এসেছেন। ভাবতে অবাক লাগে এটা কী করে সম্ভব হয়েছে? সম্ভব হয়েছে হিন্দু বা সনাতন ধর্মের অন্তর্লীন বহুত্বের কারণে। দেশে ধর্মকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত সাম্প্রদায়িক হানাহানি মাঝে মাঝে মাথা চাড়া দিত কারণ হিসেবে বলা হতো কতিপয় দুষ্কৃতীদের চক্রান্ত। সকলের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ছিল। হিংসা নয় শান্তি, এটাই ছিল সনাতনী দর্শন।

এই সনাতনী শান্তির দর্শন পালটে যায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের ১৯২৫-এর ১৬ জুন মৃত্যুর পর থেকে। এই আবহাওয়া দ্রুত ঘোলাটে হয়ে উঠে। ১৯২৬-এ মে মাসে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কৃষ্ণনগর সম্মেলনে চিত্তরঞ্জন দাসের হিন্দু-মুসলমান চুক্তি বাতিল হয়। আলোচনা প্রেক্ষিতে এর কারণ অনুসন্ধান করলে আমরা দেখবো, এই সংকট শুরু হয় ১৯১৯ সালে খিলাফত ও সত্যাগ্রহের সম্মিলিত আন্দোলনের ভিতর দিয়ে। একদিকে ইহবাদ বিমুখ, বাস্তব বিমুখ ধর্মান্ধ আবেগ রাজনীতিতে প্রবল হয়ে ওঠে। অন্যদিকে গণবিক্ষোভ হয়ে ওঠে রাজনৈতিক আন্দোলনের মূখ্য উৎস।

গান্ধীজীর অহিংস নীতি গণবিক্ষোভের উগ্র ও হিংসাত্মক প্রকাশকে প্রভাবিত করতে পারেনি। মোপলা বিদ্রোহ ও চৌরিচৌরায় গান্ধীজীর ব্যর্থতাকেই প্রকট করছে। ফলশ্রুতি হিসেবে হিন্দু ও মুসলমানদের পার্থক্য চেতনাকে তীক্ষ্ণতর করে, সেইসঙ্গে স্পষ্ট হয়ে ওঠে দেশ ভাগ ও বঙ্গ বিভাগও। মুসলিম লিগের আন্দোলনের গতি তীব্র আকার ধারণ করে। অন্য দিকে কমিউনিস্টদের দাবি পাকিস্তান দিতে হবে, তবেই ভারত স্বাধীন হবে। দ্বিজাতিতত্ত্বে ডাইরেক্ট অ্যাকশন হিন্দু নিধনে দেশ ভাগ হয়। পক্ষান্তরে দেশ ধর্মভিত্তিক স্বাধীন হওয়ার ২৯ বছর পর ১৯৭৬-এ ৪২তম সংবিধান সংশোধন প্রস্তাবনার সঙ্গে 'সমাজতান্ত্রিক' এবং 'ধর্মনিরপেক্ষ' দুটি শব্দ যোগ করতে হয় পূর্ব পাকিস্তানকে ধর্মনিরপেক্ষ স্বাধীন বাংলাদেশ জন্ম দিতে গিয়ে। পরবর্তী ইতিহাস সকলেরই জানা। ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে একটি রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ভাষণে বলা হলো আমরা যদি নির্বাচনে জিতি পূজা বন্ধ করে দেব। এটা অনুধাবন যোগ্য যে এটা ধর্মনিরপেক্ষতারই ফলশ্রুতি। পক্ষান্তরে বাংলাদেশ কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটি ইতিমধ্যেই মুছে ফেলেছে।

—রবীন্দ্রনাথ রায়,
শিয়ালদহ, রাশিডাঙা, কোচবিহার।

হিন্দুত্ব ত্যাগ করার মূল্য দিতে হলো উদ্ধব ঠাকরেকে

শিব সেনার ৫৫টা এমএলএ-র মধ্যে চলে গেল ৩৯ জন। সত্য কথা হলো, একনাথ শিন্ডের হাতে চলে এল শিব সেনার চাবি। শুধু মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার লোভে উদ্ধব ঠাকরে জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে বিজেপিকে ছেড়ে, এনসিপি এবং কংগ্রেসের হাত ধরা খুব ভুল ছিল। হোম মিনিস্টার অনিল দেশমুখ ও অন্য এক মন্ত্রী বর্তমানে জেলে। অনিল দেশমুখ পুলিশ পোস্টিঙে ঘুস নিত। নবাব মালিকের সঙ্গে অন্ধকার জগতের ও ডি-কোম্পানির যোগ প্রমাণিত। পালঘরে সাধুদের হত্যার পর বড়রা কংগ্রেসের ভয়ে উদ্ধব ঠাকরে চুপ ছিল। কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা তোলার পর শিব সেনা খুশি হলেও প্রিয়াঙ্কা বড়রা ৩৭০ ধারা তোলার সমালোচনা করলে শিব সেনা চুপ ছিল। কংগ্রেস ও কিছু দেশবিরোধী সংগঠন 'শাহিনবাগ মডেল' দেশব্যাপী চাইছিল তখনও শিব সেনার ভূমিকা লজ্জাজনক ছিল। সুশান্ত সিংহ রাজপুতের বিতর্কিত মৃত্যুর পর শিব সেনার ভূমিকা দেশবাসী আজও ভুলতে পারেনি। আজ মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রীকে সরকারি বাংলো ছেড়ে নিজের বাড়িতে চলে আসতে হলো। এটা কতটা হতাশা থেকে করতে হয়েছে তা সহজেই অনুমেয়। মুখ্যমন্ত্রী নিজের ছেলে আদিত্যকে শুধু মন্ত্রীই করেননি, তাকে বলতে গেলে সবার মাথায় বসিয়ে ছিলেন। আজ তার মূল্য চোকাতে হচ্ছে।

হিন্দুত্বকে অবহেলা, হিন্দুত্বকে অমর্যাদা করলে আর হিন্দুরা মেনে নেবে না। আশা করি এবার আর এই আগুন নিয়ে খেলা বন্ধ হবে।

—শ্যামল কুমার হাতি,
চাঁদমারি, হাওড়া-৯।

অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থা

ঘটনা-১ : মুরারইয়ের তিয়রপাড়া রাধারানি হাইস্কুল। জেলা বীরভূম। অনুব্রত মণ্ডলের জেলা। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শান্তিনিকেতনের স্পর্শ ধন্য জেলা। সেই জেলারই একটি স্কুল, পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রীর সংখ্যা ৩৪২ জন। কতজন শিক্ষক আছেন? একজন মাত্র পার্শ্ব শিক্ষক আছেন। আর আছেন একজন গ্রুপ সি স্টাফ, একজন গ্রুপ ডি স্টাফ। তাহলে পড়াচ্ছেন কারা?

গ্রুপ সি, গ্রুপ ডি আর একমাত্র পার্শ্ব শিক্ষক ক্লাস নিচ্ছেন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। শিক্ষা মন্ত্রী জানেন? উত্তর হলো— বিকাশ ভবন জানে। তাহলে? নির্দেশ এসেছে এভাবেই চালাতে হবে। স্কুল বন্ধ করা যাবে না। মন্ত্রীর নির্দেশ।

ঘটনা-২: উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ির ক্রান্তি জুনিয়র বালিকা বিদ্যালয়। ক্রান্তি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত সাতহাত কালী বাড়ির সামনে এই স্কুল। ছাত্রী কত? ৪৫০-এর

ফঃ ৩

আশেপাশে। শিক্ষিকা কতজন? উত্তর : একজন, নাম : মৌতপা বকসী, তাঁকে সাহায্য করতে একজন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী আছেন। দরজা খোলা থেকে পড়ানো দুজন মিলে সামলাচ্ছেন সব। বিকাশ ভবন জানে? —জানে কিন্তু কিছু করার নেই। স্কুল বন্ধ করা যাবে না। নবান্নের নির্দেশ।

ঘটনা-৩ : সরকারের টাকা নেই তাই রাজ্যে ১ লক্ষ ৪৮ হাজার স্কুল শিক্ষকের পদ অপূর্ণ। গান্ধী মূর্তির পাদদেশে চাকরি হয়েও যাঁদের চাকরি দেয়নি মমতার সরকার সেই প্রায় সাড়ে তিন হাজার ছেলে মেয়ের আন্দোলন ৪০৬ দিনে পড়ল। শহিদ মিনারের কাছে তাঁবু খাটিয়ে বসে আছেন শারীর শিক্ষার হবু শিক্ষকরা। আজও অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার তাঁরা পাননি। ২০১৪ সালের টেট উত্তীর্ণরা হাজরার মোড়ে গিয়ে মিছিল করে হাজতে যাচ্ছেন।

ঘটনা-৪ : তেহট্টর বিধায়ক তাপস সাহার বিরুদ্ধে চাকরি দেওয়ার বিনিময়ে ২ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ করছেন তৃণমূলেরই লোকজন। রায়দিঘী থেকে তাঁর আপ্তসহায়ক প্রবীর কয়াল, সঙ্গী শ্যামল কয়াল, সুনীল মণ্ডল ধরা পড়ল ২৫ লক্ষ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে। বাগদার এক চন্দন মণ্ডল কয়েক কোটির ব্যবসা করছেন চাকরি দিয়ে। তিনি ১০০ শতাংশ সফল ছিলেন নাকতলার সঙ্গে হট লাইনে কানেকশনের দৌলতে। বিকাশ ভবনের দেওয়ালের টিকটিকিগুলোও জানে এই সংবাদ।

ঘটনা-৫ : পার্থ চ্যাটার্জি এখনও জেলের বাইরে। জাস্টিস অভিজিৎ গাঙ্গুলি প্রায় ধরার ব্যবস্থা করে ফেলেছিলেন। ডিভিশন বেঞ্চ লাইফ লাইন দিল। কী কারণে সবাই জানে।

ঘটনা-৬ : শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু কোথায়? শোনা যাচ্ছে নন্দনে। ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে। বিকাশ ভবনে? —কদাচিৎ-কখনো সময় পেলে, সময় হলে। মন ভালো থাকলে!

ঘটনাগুলো ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬ করে লিখলাম বাঙ্গলার শিক্ষা ব্যবস্থার আসল অবস্থাটা বোঝাবার জন্য। একটা অনুরোধ রাখলাম কেউ যদি পারেন এই নিবেদন পত্রটি বাঙ্গলার আনাচে কানাচে থাকা শিক্ষাবিদদের কাছে ছড়িয়ে দেবেন। এবং অবশ্যই লেসার এভিলের প্রবক্তাদের। আর হ্যাঁ অবশ্যই কবি জয় গোস্বামী, শ্রীজাত, কৌশিক সেন, নৃসিংহ প্রসাদ ভাদুড়ি, সুজাত ভদ্র, সুবোধ সরকার, পরমব্রত, অভিরূপ সরকারের মতো যোদ্ধাদের। পত্রটি পড়ার অনুরোধ রইল বাঙ্গলার স্বঘোষিত তথাকথিত চিন্তাশীল অভিভাবকদের।

—দীপক খাঁ,
পাটপুর, বাঁকুড়া।

বঙ্গভঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গের জন্ম এবং বাংলাদেশের উদ্ভব

ড. নারায়ণ চক্রবর্তী লিখিত 'পশ্চিমবঙ্গের জন্ম ও তার পটভূমি 'প্রবন্ধটির জন্য তাঁকে সাধুবাদ জানাই। বর্তমান প্রজন্মের অনেকে হয়তো জানেই না অখণ্ড বঙ্গ কেনই-বা দ্বিখণ্ডিত হলো কেনই-বা পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের সৃষ্টি হলো। ভারতের মুসলমানদের জন্য যখন পৃথক দেশের দাবি গৃহীত হলো তখন স্থির হয়েছিল মুসলমান প্রধান সিন্ধু, বালুচিস্তান, পঞ্জাব, কাশ্মীর এবং অখণ্ড বঙ্গদেশ নিয়ে পাকিস্তান গঠিত হবে। এতে তৎকালীন কংগ্রেস নেতাদেরও কোনও আপত্তি ছিল না। আর তৎকালীন ইংরেজ সরকার তো চাইছিলই তাই। কিন্তু রুখে দাঁড়িয়েছিলেন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি। তিনি দাবি করেছিলেন যদি ভারতের মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলি নিয়ে পাকিস্তান গঠন করা হয় তাহলে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ পশ্চিমবঙ্গ কেন পাকিস্তানে যাবে? তখন পঞ্চায়েত সিস্টেম ছিল না, ছিল ইউনিয়ন বোর্ড। তিনি বাঙ্গলার প্রতিটি ইউনিয়ন বোর্ড থেকে জনসংখ্যার তথ্য সংগ্রহ করে প্রমাণ করে দেখালেন পূর্ববঙ্গ মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও পশ্চিমবঙ্গ ছিল হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে ১৯৪১ সালের জনগণনার প্রাক্কালে গান্ধীজীর নির্দেশ ছিল বাঙ্গলার কংগ্রেস নেতাদের ওপর যাতে বাঙ্গলার হিন্দুরা যেন ওই জনগণনায় অংশগ্রহণ না করে। অথচ মুসলিম লিগ নেতা মহম্মদ আলি জিন্নার নির্দেশ ছিল বাঙ্গলার কংগ্রেসের প্রতিটি মুসলমান যেন জনগণনায় অংশগ্রহণ করে। যাইহোক ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি যখন প্রমাণ করে দেখালেন পশ্চিমবঙ্গ হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল এবং দাবি করলেন হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ পশ্চিমবঙ্গ অবশ্যই ভারতের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে তখন তৎকালীন ইংরেজ সরকারও সে দাবি নাকচ করতে পারেনি। ফলে বাঙ্গলা ভাগ হয়েছিল এবং হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ পশ্চিমবঙ্গ ভারতের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। মুসলমান তাণ্ডবের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, নিবন্ধকার যথার্থই উল্লেখ করেছেন 'গান্ধীজীর কর্মপদ্ধতির মধ্যে আন্দোলনের নামে ব্রিটিশ শক্তিকে বিব্রত না করা, মুসলিম লিগের সব দাবিগুলিতে নীরবতার মাধ্যমে (মৌনং সম্মতি লক্ষণ) সমর্থন করা ও জওহরলালের নেতৃত্বে তাঁর বশংবদদের হাতে যাতে ক্ষমতা হস্তান্তর হয় তা দেখা। নিবন্ধকার আরও লিখেছেন, 'এদিকে তখন কমিউনিস্ট পার্টি পুরোপুরি পাক-ই-স্তান গড়ার সমর্থনে ও পুরো বঙ্গপ্রদেশকে পাক-ই-স্তানের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ওকালতি শুরু করে' এমত অবস্থায় সমুদয় বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বলা ভালো তাঁর একক প্রচেষ্টায় পশ্চিমবঙ্গকে ভারতের সঙ্গে যুক্ত করতে পেরেছিলেন। অথচ অত্যন্ত দুঃখের, পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান প্রজন্ম পশ্চিমবঙ্গের স্রষ্টা শ্যামাপ্রসাদ সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানেই না।

—শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়,
ডেজিরে কমপ্লেক্স, বড়বাজার,
চন্দননগর।

With Best Compliments from -
A Well Wisher

এক নারীর অনন্যা হওয়ার গল্প

রাখী ব্রহ্ম

এবার অঙ্গনার পাতায় এক সত্যিকারের গল্প। যা হার মানাবে রূপকথার গল্পগুলিকে। যার সম্পর্কে আপনাদের শোনাতে চলেছি তাঁর পরিচয়টা প্রথমে জানিয়ে দিই। সুরভি লস্কর পেশায় অঙ্কের শিক্ষিকা। সিঙ্গিমারী চন্দ্রদেব উচ্চতর বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন তিনি। দুচোখে স্বপ্ন নিয়ে আর পাঁচটি বাচ্চার মতো তিনিও বড়ো হয়ে উঠছিলেন। হঠাৎই বাবার অসুস্থতা। মাত্র কুড়ি বছর বয়সে বিয়ে হয়ে জলপাইগুড়ি থেকে চলে যান ভায়েরথান নামে এক প্রত্যন্ত গ্রামে। সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশ। তবে কি বুকের মাঝে লুকিয়ে রাখা স্বপ্নের মৃত্যু হেঁশেলেই শেষ হয়ে যাবে; নাকি বীরাঙ্গনার মতো এগিয়ে যাবেন সেই প্রবাদকে সম্বল করে 'যে রাঁধে সে চুলও বাঁধে'?

গল্পের সাদাকালো ছায়াছবির শুরু এখান থেকে। উনুনে কাঠ দিলে আগুনটা যেমন গনগন করে জ্বলে উঠত সঙ্গে সঙ্গে তেলও গরম হয়ে তেতে উঠত। কড়ায় ফোড়ন দিয়ে তরকারি রাঁধতে রাঁধতে একদিন সুরভি অনুভব করলেন নাকে বেশ সুন্দর গন্ধ আসছে। সেই সময় ভেতরের স্বপ্নগুলিও আগুনের মতো জ্বলে উঠলো স্বপ্ন পূরণের জন্য। ভেতরের সুরভিকে কেউ যেন বলত— 'বিয়ে হওয়া, সন্তানের জন্ম দেওয়া এগুলো জীবনের একটা অংশ। এগুলো স্বপ্নের মৃত্যু ঘটায় না। তিনি বুঝেছিলেন স্বপ্ন দেখা, কাউকে স্বপ্ন দেখানো আর সুন্দর ভাবে বাঁচতে চাওয়াটা ভুল নয়।

এবার ছায়াছবির গল্প বাঁক নিল সাদা-কালো থেকে রঙিন জগতে। সংসারকে ভালো রেখে স্বপ্ন পূরণ করার আরেক নাম সুরভি লস্কর। বিয়ের পর বিএসসি পাশ করে স্কুল প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়ে অঙ্কের শিক্ষিকা হিসেবে দীর্ঘদিন মুর্শিদাবাদে শিক্ষকতা করেছেন। তারপর সিঙ্গিমারী চন্দ্রদেব উচ্চতর বিদ্যালয়ে যোগদান করেন। ছোটো থেকে সুরভিদেবী ভালোবাসতেন প্রকৃতির সঙ্গে মিশে থাকতে। প্রকৃতির মাঝে ফুসফুস ভরে অক্সিজেন নেবার জন্য স্বামীর কাছে আবদার করে কয়েকদিনের ছুটির জন্য বলেছিলেন, সংসারে তো কাজের দিদিরাও ছুটি পান। আদ্যপ্রান্ত সহযোগী মানুষ তাঁর স্বামী রবিনবাবু। তিনি এই পথ চলাতে সাহায্য করেন সুরভিকে। উত্তরাখণ্ডের ছোটো ছোটো পাহাড়ে একাধিকবার গিয়ে সেখানকার জনজাতি সম্পর্কে জেনেছিলেন। ২০১৯ সালে তাঁর ইচ্ছে হয় দেশের সীমানার বাইরে ভুটানে গাড়ি চালিয়ে যাবেন স্বপ্নের হাতছানিতে ঘরছেড়ে। একদিন ভোর তিনটে নাগাদ জলপাইগুড়ি থেকে একাকী একজন মহিলা স্টিয়ারিঙে হাত রেখে শুরু করলেন রোমহর্ষক যাত্রা। ভুটান সরকারের দেওয়া উনিশ বছরের এক গাইডকে নিয়ে রাত আটটা থেকে ভুটানের পাহাড়ে তাঁর অভিযান শুরু হয়। কুয়াশায় পথ ঢাকা সরুরাস্তা, ভয়ংকর বাঁক। ভোরের দিকে চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে ভালুকের দেখাও মিলেছিল পথে। এক সময় মনে হয়েছিল এত চড়াই, উতরাই, কুয়াশা, চোখ ধাঁধানো এগুলো ভেদ করে তিনি পারবেন না লক্ষ্যে পৌঁছতে, জীবনের রথ বুঝি থেমে যাবে। পরক্ষণেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রতি ভরসা রেখে অবশেষে সুরভি ভুটানে প্রথম একজন মহিলা হিসেবে ড্রাইভিং করেছিলেন। 'ইন্ডিয়া বুক অব রেকর্ড' তাঁকে এই নিরিখে সম্মানিত করেছে যে ভারতবর্ষ থেকে একজন মহিলা যিনি সেল্‌ফ ড্রাইভে নিজের গাড়ি নিয়ে পুরো ভুটান ভ্রমণ করেছেন। এই ট্রিপে তাঁর একটি বার্তা ছিল 'উওমেনস এমপাওয়ারমেন্ট' বা নারী ক্ষমতায়ন।

এখানেই তিনি থেমে থাকেননি। মহাভারতের সব্যসাচীর মতো সুরভিও ২০১২ সালে শরীর সুস্থ-সবল রাখার জন্য যোগ ক্লাসে ভর্তি হন। ২০২০-তে পঞ্জাবে অনুষ্ঠিত অনলাইন ন্যাশনাল যোগ কমপিটিশানে তিনি চ্যাম্পিয়ন হন। তার পরপরই অনলাইন ইন্টারন্যাশনাল যোগ অলিম্পিকে অংশগ্রহণ করেন।

সুরভি লস্করের সঙ্গে কথা বলতে বলতে দুচোখ ভিজে চশমার কাচ ঝাপসা হয়ে গেছিল। আবছা দৃষ্টিতে অন্ধকার জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিলাম, শেষে দেখলাম, কখন চশমার জল শুকিয়ে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। বাইরেটাও কখন পরিষ্কার হয়ে গেছে। গর্ব হলো এক নারী হিসেবে আরেক নারীর স্বপ্নপূরণের কাহিনি বলার।

তিনিও আশা রাখেন তাঁর এই কাহিনি অনেক নারীর স্বপ্নপূরণের হাতিয়ার হবে। মনে মনে ভারতমাতাকে ধন্যবাদ জানালাম। ভারতমায়ের বুকেই তো বারবার জন্মেছে সতী সাবিত্রী, সীতা, দময়ন্তী, আবার আরতি সাহা, দূর্বা ব্যানার্জি, কল্পনা চাওলা। এগিয়ে চলুন সুরভি লস্কর। আপনার সেই রঙে সুরভিত হোক আরও অনেক ভারতীয় নারী। □

বারবার মুখ শুকিয়ে যাওয়া বড়ো বিপদের লক্ষণ

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

অনেকেই বলে থাকেন মুখ শুকিয়ে যায়। পর্যাপ্ত জল পানের পরও এই সমস্যা অনেকের দেখা দেয়। অনেকে এটি ডায়াবেটিসের লক্ষণ বলে ধরে নেন। ডায়াবেটিসের চেয়েও বড়ো সমস্যার কারণে এমনটি হতে পারে। এই সমস্যা দীর্ঘদিন চলতে থাকলে মারাত্মক বিপদও হতে পারে। হরমোনের তারতম্যের কারণে মুখে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে। থাইরয়েড হরমোনের বেশি হওয়ার কারণে বার্নিং মাউথ সিনড্রোম অর্থাৎ মুখে জ্বালাপোড়া হতে পারে। যাদের থাইরয়েড হরমোনের পরিমাণ কম থাকে তাদের ক্ষত বা আলসার দেরিতে শুকায়। হাইপোথাইরয়েডিজমে রোগীরা জিহ্বার মেটালিক স্বাদ পেতে পারে। মাঝে মাঝে হাইপোথাইরয়েডিজমে জগ্রেন্স সিনড্রোম দেখা দিয়ে থাকে, যার কারণে শুষ্ক মুখের সৃষ্টি হয়ে থাকে।

শুষ্ক মুখের প্রভাবে দন্তক্ষয়ের পরিমাণ বেড়ে যায়। হাইপোথাইরয়েডিজমে প্রাপ্ত বয়স্কদের ক্ষেত্রে ম্যাক্রোগ্লসিয়া বা জিহ্বা বড়ো হতে পারে। ঠোঁট বড়ো হয়ে যেতে পারে। এটি হতে পারে জল এবং প্রোটিন জমা হওয়ার কারণে। ম্যান্ডিবল আন্ডার ডেভেলপড বা সঠিকভাবে গঠন হয় না অথবা পুরোপুরি গঠন হয় না। তাছাড়া পেরিওডেন্টাল রোগের ঝুঁকি থাকে। থাইরয়েড হরমোন কম বা বেশি হলে পেরিওডেন্টাল রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। হাইপারথাইরয়ডিজমে পেরিওডেন্টাল রোগ, ম্যাক্সিলারি বা ম্যান্ডিবুলার অস্টিওপরোসিন এবং দাঁত তাড়াতাড়ি ওঠে।

হাইপোথাইরয়েডিজমের রোগীদের ঘা বা ক্ষত যেহেতু দেরিতে শুকায় সে কারণে অস্ত্রোপচারের পর সংক্রমণের ঝুঁকি বেড়ে যায়। তাই দাঁত তোলা অথবা সার্জারির সময় সতর্ক থাকতে হবে। বয়ঃসন্ধিকালে ইস্ট্রোজেন এবং প্রজেসটেরন হরমোন বেশি নিঃসরণ হওয়ার কারণে মাড়ির রোগ দেখা দিতে পারে। দাঁতে পাথর থাকলে স্কেলিং করিয়ে নিতে হবে। জিনজাইভাল হাইপারপ্লাসিয়া হতে

পারে। মনে রাখতে হবে কিছু ওষুধের কারণেও জিনজাইভাল হাইপারপ্লাসিয়া হতে পারে। ঋতুস্রাবের সময় প্রজেসটেরন হরমোন বেশি হওয়ার কারণে মাড়িতে আলসার-সহ বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিতে পারে। তবে এসব ক্ষেত্রে তেমন কোনো চিকিৎসার প্রয়োজন নেই।

গর্ভাবস্থায় প্রথম তিন মাস ইস্ট্রোজেন লেভেল দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এতে বমি বমি ভাব হতে পারে। এই সময় গর্ভবতীর মুখের অধিকতর যত্ন নিতে হবে। শুধু ইস্ট্রোজেন নয় বরং প্রজেসটেরন লেভেলও বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। দুটি হরমোন বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে মাড়িতে রক্ত সঞ্চালনও বেশি হয়। সে কারণে মাড়ি অধিকতর সংবেদনশীল হয়ে থাকে। মাড়ি ফুলে যেতে পারে। এই সময় জেল জাতীয় টুথপেস্ট ব্যবহার করবেন না। গর্ভাবস্থায় তিন থেকে ছয় মাসের মধ্যে মুখ ও দাঁতের চিকিৎসা করে নিতে হবে। পিরিয়ড যখন বন্ধ হয়ে যায় তখন হরমোনের তারতম্যের কারণে বার্নিং মাউথ সিনড্রোম বা মুখের জ্বালাপোড়া দেখা দিতে পারে।

হরমোনের তারতম্যের কারণে অনেক সময় মেয়েদের মেজাজ খিটখিটে থাকে। তাই মুখের কোনো সমস্যা দেখা দিলে অবশ্যই মুখের ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। মেনোপজের সময় বা মেনোপজ পরবর্তীকালে বিষণ্ণতায় আক্রান্ত হলে মুখে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দেখা দিয়ে থাকে। তাই এসব বিষয়ে অবশ্যই সচেতন হতে হবে। মেনোপজ পরবর্তীকালে নারীর মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। মেনোপজের সময় হরমোনের তারতম্যের কারণে শুষ্ক মুখ হতে পারে। শুষ্ক মুখের কারণে মুখে তেতো স্বাদ হতে পারে। জন্ম নিয়ন্ত্রণ বড়ি সেবন করলে শুষ্ক মুখ হতে পারে। মুখে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হতে পারে। মনে রাখতে হবে অন্যান্য অনেক কারণে একই ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়।

দাঁত তোলার পর ড্রাই সকেট ব অ্যালভিওলার অস্টাইটিস দেখা দিতে পারে। ক্রমাগত দুশ্চিন্তা করলে স্ট্রেস হরমোন কর্টিসল নিঃসৃত হয়ে থাকে। এই ধরনের রোগীদের ইতিহাস-সহ পূর্ণ ইতিহাস গ্রহণ করতে হবে। সব ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করার পরেই রোগীর মুখের চিকিৎসা প্রয়োজন হলে করতে হবে। অক্সিটোসিন হরমোন বা ভালো হরমোন মুখের প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে থাকে।

অতিরিক্ত মানসিক চাপে দাঁত কামড়ানো, ক্যানসার সোর বা ক্ষত, মাড়ির রোগ এবং টেম্পোরোম্যান্ডিবুলার জয়েন্টের অচলাবস্থা দেখা দিতে পারে। অ্যাড্রিনালিন হার্ট রেট বৃদ্ধি করে, রক্তচাপ বৃদ্ধি করে। দাঁতের চিকিৎসার সময় রোগী অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা করলে চিকিৎসা শুরু করার আধ ঘণ্টা আগে ট্রাংকুলাইজার জাতীয় ওষুধ প্রয়োগ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে রোগীর আগের ইতিহাস অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। হরমোনের কম-বেশি হওয়ার কারণে আমাদের শরীরে এবং মুখে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়ে থাকে। তাই হরমোন সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। ▯

সাধারণ মানুষের অসাধারণ জীবন

অভিরূপ গঙ্গোপাধ্যায়

আসন্ন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে এনডিএ তাদের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে দ্রৌপদী মুর্মুর নাম ঘোষণা করার পর থেকে সারা দেশে বেশ হইচই শুরু হয়ে গেছে। মূলত বাম-উদারনৈতিক ও ধর্মনিরপেক্ষ শিবির থেকে ভেসে আসছে নানারকম মন্তব্য। কেউ বলছেন দ্রৌপদী 'রাবার স্ট্যাম্প' রাষ্ট্রপতি হবেন। আবার কেউ-বা বলছেন ২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের দু' বছর আগে এটা নরেন্দ্র মোদীর 'ইলেকশন স্টান্ট'। অর্থাৎ জনজাতি ভোটব্যাংকের দিকে তাকিয়ে নেওয়া হয়েছে এমন একটি সিদ্ধান্ত। ভারতের বিরোধী রাজনীতির 'মেধা' যে তলানিতে পৌঁছে গেছে এই আলটপকা মন্তব্য তার প্রমাণ।

সব কা সাথ, সব কা বিকাশ, সব কা প্রয়াস

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রার্থী হিসেবে দ্রৌপদী মুর্মুর নাম ভাবা বিজেপির ইলেকশন স্টান্ট কিনা সেটা দলের গত দুই দশকের রাজনীতির ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে। এখনও পর্যন্ত দেশকে দু'জন রাষ্ট্রপতি উপহার দিয়েছে বিজেপি— এপিজে আবদুল কালাম ও রামনাথ কোবিন্দ। একজন মুসলমান এবং অন্যজন পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর। এই তালিকায় সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর দ্রৌপদী মুর্মুর নাম একেবারেই বেমানান নয়। বরং মোদী সরকার যে সত্যি সত্যিই সব কা সাথ, সব কা বিকাশ, সব কা প্রয়াস এবং সব কা বিশ্বাসে আস্থা রাখে, এই মনোনয়ন তার প্রমাণ। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিজেপি- মনোনীত প্রার্থী হিসেবে দ্রৌপদী মুর্মুর নাম ঘোষিত হবার পর সঙ্গত কারণেই প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মু দীর্ঘদিন ধরে সমাজের গরিব, পিছিয়ে পড়া ও প্রান্তিক মানুষের জন্য কাজ করছেন। ওঁর প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং ঝাড়খণ্ডের রাজ্যপাল হিসেবে প্রশংসনীয় কাজ করেছেন। আমি নিশ্চিত দ্রৌপদী মুর্মু ভারতের রাষ্ট্রপতি হিসেবেও উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবেন।'

নির্বাচিত হলে দ্রৌপদী মুর্মু হবেন ভারতের প্রথম সাঁওতাল জনজাতিভুক্ত রাষ্ট্রপতি। ভারতের প্রথম মহিলা রাষ্ট্রপতি ছিলেন প্রতিভা পাটিল (২০০৭-২০১২)। দ্রৌপদী হবেন দ্বিতীয় মহিলা এবং ওড়িশা থেকে নির্বাচিত প্রথম রাষ্ট্রপতি। এই প্রথম দেশ এমন একজনকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে পেতে চলেছে যার জন্ম স্বাধীনতার পরে।

কে এই দ্রৌপদী মুর্মু

দ্রৌপদী মুর্মু এক কথায় একজন সাধারণ মানুষ। অতি সাধারণ বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না। এবং এটাই বিজেপির ইউএসপি যে তারা সর্বস্তরে এলিটিজমকে পরিহার করে সাধারণ মানুষকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে।

দ্রৌপদী মুর্মুর জন্ম ১৯৫৮ সালের ২০ জুন। ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ জেলার কুসুমি

ওড়িশার প্রত্যন্ত গ্রামের এই বাড়ি থেকেই পথচলা শুরু।

মন্দিরে ঝাড়ু দিচ্ছেন দ্রৌপদী মুর্মু

তহশিলের উপারবেদা গ্রামের নাম সম্ভবত অনেকেই শোনেননি। এই গ্রামেই জন্ম দ্রৌপদীর। সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা গ্রামের স্কুলে। গরিব পরিবারের মেয়েরা খুব তাড়াতাড়ি বড়ো হয়ে যায়। দ্রৌপদীও তার ব্যতিক্রম নন। তেরো-চোদ্দ বছর বয়েস থেকেই তাঁর মাথায় কয়েকটা কথা সর্বক্ষণ ঘুরত। এগোতে হবে, অনেকদূর এগোতে হবে। পড়াশোনা করে বড়ো হয়ে চাকরি করে সংসারের হাল ধরতে হবে।

একদিন দ্রৌপদীদের গ্রামে রাজ্যের এক মন্ত্রী এলেন। সদ্য সপ্তম শ্রেণীতে ওঠা মেয়েটি ম্যাট্রিক পাশ ঠাকুমার অনুপ্রেরণায় এবং বাবার পরামর্শে সমস্ত সার্টিফিকেট নিয়ে ছুটে গেল মন্ত্রীর কাছে। মিটিঙের মাঝেই দৌড়ে হলে প্রবেশ করে মন্ত্রীর হাতে সার্টিফিকেটগুলো দিয়ে বলল, 'আমি আরও পড়তে চাই। শহরের ভালো স্কুলে পড়াশোনা করতে চাই'। মন্ত্রীর উদ্যোগে মেয়েটি প্রথম শহর দেখল, ভর্তি হলো শহরের স্কুলে। স্কুলের পড়া শেষ করে দ্রৌপদী ভুবনেশ্বরের রমাদেবী উওমেনস কলেজে ভর্তি হলেন। সেখান থেকে বি.এ পাশ করার পর শুরু হলো চাকরির খোঁজ। এবং 'সাঁওতাল মেয়ে আবার চাকরি করবে'— এই জাতীয় অজস্র বাঁকা কথা নীরবে হজম করে একদিন যোগ দিলেন চাকরিতে।

কর্মজীবন

দৌপদী মুর্মুর কর্মজীবন শুরু হলো ওড়িশা সরকারের সেচ ও বিদ্যুত দপ্তরে, জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে। বাংলায় যাকে করণিক বলে। সেটা ১৯৭৯ সাল। এখানে তিনি ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত চাকরি করেন। এরপরের চাকরি ১৯৯৪ সালে। এ বছর তিনি রায়রঙ্গপুরের শ্রীঅরবিন্দ ইনটিগ্রাল এডুকেশন সেন্টারে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। এই চাকরির মেয়াদ ১৯৯৭ পর্যন্ত। এই বছরেই তিনি যোগ দেন বিজেপিতে।

ব্যক্তিগত জীবন

সময়টা প্রথম চাকরি পাবার কিছুদিনের মধ্যেই। এই সময়ে দ্রৌপদীর বিয়ে হয়ে গেল ব্যাংক কর্মচারী শ্যামাচরণ মুর্মুর সঙ্গে। প্রত্যাশিত ভাবেই বাড়ির বউ চাকরি করবে, এতে শ্বশুরবাড়ির ছিল ঘোরতর আপত্তি। ছেড়ে দিলেন চাকরি। এই সময় দ্রৌপদীর দুই ছেলে এবং এক মেয়ের জন্ম হলো। ছেলে-মেয়েরা একটু বড়ো হবার পর শ্রীঅরবিন্দ ইনটিগ্রাল এডুকেশন সেন্টারের চাকরিতে যোগ দেন। তবে এবার বিনা বেতনে। পড়ানোর দক্ষতা এবং সবার সঙ্গে মিশে যাওয়ার অপরিসীম ক্ষমতার জন্য স্বল্প সময়েই জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের মধ্যে। পাশাপাশি চলছিল সমাজসেবামূলক কাজ ও রাজনীতি।

এই পর্যন্ত সব ঠিকই ছিল। কিন্তু জীবন হঠাৎ কঠিন পরীক্ষা নিতে শুরু করল

দ্রৌপদী মুর্মুর

যে মন্ত্রীর সৌজন্যে শহরের স্কুলে ভর্তি হতে পেরেছিলেন তাঁরই এক বন্ধু প্রথম বুঝতে পারেন দ্রৌপদীর আসল জায়গা রাজনীতি। তখন দ্রৌপদী নানারকম সমাজসেবামূলক কাজ করছেন। ওদিকে মন্ত্রীর সেই বন্ধু রাজনীতিতে যোগ দেবার জন্য দ্রৌপদীকে অনুরোধ-উপরোধ করে চলেছেন। কিন্তু দ্রৌপদী নারাজ। রাজনীতির বাইরে থেকেই সমাজের কাজ করতে চান। উপায়ান্তর না দেখে মন্ত্রীর বন্ধু গিয়ে ধরলেন দ্রৌপদীর স্বামী শ্যামাচরণবাবুকে। স্বামীর অনুরোধেই দ্রৌপদী মুর্মু রাজি হন এবং ১৯৯৭ সালে ময়ূরভঞ্জের নোটিফায়েড এরিয়া কাউন্সিলের কাউন্সিলরের পদে নির্বাচনের জন্য বিজেপির হয়ে মনোনয়নপত্র জমা দেন। এবং বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন। প্রথমবার

রাষ্ট্রপতি এপিজে আবদুল কালামের সঙ্গে

দ্রৌপদীর। ২০০৯ লালে হঠাৎ মৃত্যু হলো দ্রৌপদীর বড়ো ছেলের। তিনি শোকে ভেঙে পড়লেন। সামলে ওঠার জন্য আরও বেশি করে কাজে ডুবে গেলেন। কিন্তু ২০১৪-র এক অভিশপ্ত রাতে ছোটো ছেলেটিও মারা গেল দুর্ঘটনায়। দ্রৌপদী ও শ্যামাচরণ মানসিক অবসাদে ডুবে গেলেন। দ্রৌপদী অসাধারণ মানবিক শক্তির অধিকারী হলেও শ্যামাচরণ ততটা নন। কিছুদিনের মধ্যে অবসাদ সামলাতে না পেরে তিনি মারা যান।

এই ঘটনার অল্প কিছুদিনের মধ্যে মারা যান দ্রৌপদীর মা আর দাদাও। মাত্র এক বছরে এতগুলো মৃত্যু দ্রৌপদী মেনে নিতে পারেননি। শেষ অবলম্বন হিসেবে জড়িয়ে ধরেন যোগ ও আধ্যাত্মিকতাকে। যোগ দেন প্রজাপালিকা ব্রহ্মকুমারী সঙ্ঘে। সিস্টার নির্মলার স্নেহে ও সেবায় দ্রৌপদী ফিরে আসেন জীবনের মূল স্রোতে। নিজের জীবন সম্পর্কে বলতে গিয়ে দ্রৌপদী বলেছেন, 'আমি জীবনে অনেক উত্থান-পতন দেখেছি। স্বামী ও দুই সন্তানকে হারিয়ে আমি প্রায় তলিয়ে গিয়েছিলাম। ঈশ্বর আমাকে শক্তি জুগিয়ে ফিরিয়ে এনেছেন যাতে আমি মানুষের সেবা করতে পারি।'

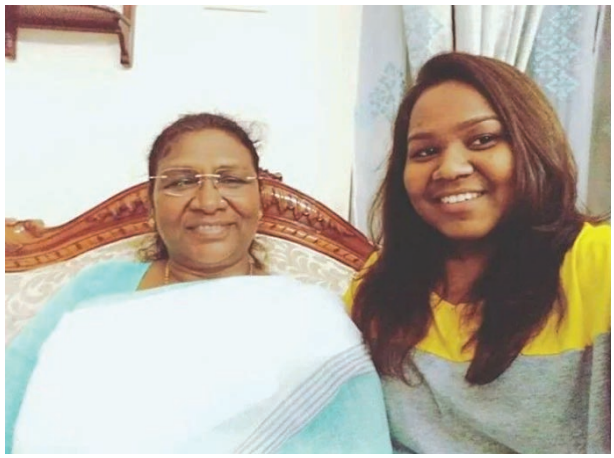

মেয়ের সঙ্গে

রাজনৈতিক পথচলা

কাউন্সিলর হয়েই বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান পদে মনোনীত হন।

তখন দ্রৌপদীর রথ হাওয়ার বেগে উড়ছে। ২০০০ সাল। তখনও কাউন্সিলর পদের মেয়াদ শেষ হয়নি। ওড়িশায় বিধানসভা নির্বাচন। বিজেপির সঙ্গে বিজেডি-র জোট হয়েছে। দলের অনুরোধে দ্রৌপদী কাউন্সিলর পদে ইস্তফা দিয়ে ভোটে দাঁড়ালেন। জিতলেন বিপুল ভোটে। এবং প্রথমবার বিধায়ক হয়েই পরিবহণ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন। এবার এলো এক কঠিন চ্যালেঞ্জ। সাঁওতাল মহিলা মন্ত্রিত্ব সামলাবেন? বেঁকে বসলেন আইএএস অফিসার এবং দপ্তরের কর্মীরা। দিনরাত পড়াশোনা করে কাজের গতিপ্রকৃতি বুঝে নিলেন দ্রৌপদী। তারপর চার বছরে সামলালেন চারটি ভিন্ন ধরনের দপ্তরের মন্ত্রিত্ব।

২০০৫-এর বিধানসভা নির্বাচনে জোট ভেঙে গেল। বিজেপি একা লড়বে। এই কঠিন পরিস্থিতিতেও বিজেপির হয়ে দাঁড়িয়ে দ্রৌপদী জেতেন। হেরে যান ২০০৯-এর নির্বাচনে। এরপর আবার ফিরে যান গ্রামে। মানুষের কাজে। মাঝখানে একটি বছর অস্বাভাবিক কষ্টে কেটেছে। দ্রৌপদী হারিয়েছেন দুই ছেলে ও স্বামীকে। ২০১৫ সালে কেন্দ্রীয় সরকার দ্রৌপদীকে ঝাড়খণ্ডের

রাজ্যপাল মনোনীত করল। জনজাতি-অধ্যুষিত ঝাড়খণ্ডের প্রথম মহিলা রাজ্যপাল এবং ওড়িশা থেকে আসা প্রথম জনজাতি রাজ্যপাল হিসেবে কাজে যোগ দেন। ২০২১ সালে অবসর নেন। ফিরে যান ওড়িশায়, নিজের গ্রামে। তারপর ২০২২। আর কিছুদিনের মধ্যেই রাজনৈতিক কালিমাহীন শক্তিশালী এক ভারতীয় নারীর মুকুটে শোভা পেতে চলেছে চূড়ান্ত পালকটি। তিনিই হতে চলেছেন ভারতের প্রথম জনজাতি ও দ্বিতীয় মহিলা রাষ্ট্রপতি।

তৎকালীন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জির সঙ্গে

রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের সঙ্গে

সবাইকে সঙ্গে নিয়ে পথ চলার মন্ত্রেই বাজিমাত বিজেপির

নিখিল চিত্রকর

২৫ জুলাই ২০০২, ভারতের একাদশতম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলেন মহাকাশ বিজ্ঞানী ড. এপিজে আব্দুল কালাম। এদেশের শাসনভার সেইসময় এনডিএ জোট সরকারের কাঁধে। অটলবিহারী বাজপেয়ী প্রধানমন্ত্রী। রাষ্ট্রপতি হিসেবে কে আর নারায়ণনের মেয়াদ শেষ হলে প্রথম পছন্দ হিসেবে আব্দুল কালামকেই বেছে নিয়েছিল বাজপেয়ী সরকার। প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী সেদিন বলেছিলেন, ''যে মানুষটা ভারত মায়ের সুরক্ষার জন্য নিজের সারাটা জীবন উৎসর্গ করেছেন, জনগণ তাঁকেই ভারতের রাষ্ট্রপতি পদে দেখতে চান। দেশের সর্বোচ্চ পদে ড. কালামকে পেয়ে আমরা গর্বিত।'' অতি বড়ো সমালোচকও জানেন, ভারতীয় জনতা পার্টির দিগ্‌গজ নেতা অটল বিহারী বাজপেয়ী সেদিন কোনও নির্বাচনী কার্ড খেলেননি। ভোটব্যাংক গোছানোর তাড়াও তাঁর ছিল না। সেদিন রাষ্ট্রপতি পদের পরম্পরা ও মর্যাদাকে সম্মান জানিয়েই বেছে নেওয়া হয়েছিল ভারতের মিসাইল ম্যানকে।

ক্ষমতায় এসে ২০১৬ সালে অটলজীর দেখানো পথেই হেঁটেছেন নরেন্দ্র মোদী । তাঁর নেতৃত্বাধীন সরকার প্রণব মুখার্জির পর রাষ্ট্রপতি হিসেবে মনোনয়ন দিয়েছে রামনাথ কোবিন্দকে। যিনি ২০১৫ থেকে ২০১৭ সালের ১৫ জুন পর্যন্ত বিহারের রাজ্যপাল ছিলেন। ওই বছরেই ঐতিহাসিক ২০ জুলাই দলিত সমাজের প্রথম প্রতিনিধি হিসেবে দিল্লির রাইসিনা হিলসের প্রাসাদে পা রাখেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। তার আগে রাজনীতির ময়দানে ২০০৬ সাল পর্যন্ত একনিষ্ঠভাবে তিনি দলিত সম্প্রদায়ের উন্নতির কাজে নিযুক্ত ছিলেন। স্বরাষ্ট্র, পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রভৃতি ক্ষেত্রে তিনি দৃষ্টান্তমূলক কাজ করেছেন। তাঁকে দেশের রাষ্ট্রপতি করে নরেন্দ্র মোদীর বার্তা ছিল স্পষ্ট। এ ভারত সবার। এখানে জাতপাতের কোনও স্থান নেই। যোগ্যতা থাকলে এখানে 'পিছড়ে বর্গে'র মানুষও রাজ সিংহাসনে বসবেন। নিজেদের আমলে প্রথমে একজন সংখ্যালঘু, তারপর একজন দলিতকে রাষ্ট্রপতি করে 'পার্টি উইথ ডিফারেন্স' দলীয় ক্যাচলাইনকে সার্থক রূপ দিয়েছে জাতীয়তাবাদী বিজেপি।

ড. মনমোহন সিংহ প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন প্রতিভা পাটিলকে রাষ্ট্রপতি করেছিল সোনিয়া গান্ধীর কংগ্রেস। মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে বিচরণ করা এই নেত্রী একসময় সমবায় ব্যাংক গঠন করে আমানতকারীদের বিপুল অর্থ আত্মসাৎ করেছিলেন। সেই দুর্নীতির ভাগীদার ছিলেন তাঁর স্বামী দেবীসিং রামসিং শেখাওয়াতও। কংগ্রেসিদের রমরমা বাজারে স্বাভাবিকভাবেই প্রতিভা পাটিলদের যাবতীয় কুকর্ম চেপে দেওয়া হয়। প্রতিভা পাটিলকে খুঁজে বের করেছিলেন সোনিয়াই। ষাটের দশকে ভারতের খুব কম মহিলাই রাজনীতিতে আসতেন। তাই মহিলা রাজনীতিক হিসেবে খুব দ্রুত সামনের সারিতে উঠে এসেছিলেন প্রতিভা। একসময় মহারাষ্ট্রের মন্ত্রী হন। তারপরেই শুরু হয় আর্থিক দুর্নীতির খেলা। মহারাষ্ট্রে দরিদ্র চাষিদের সুযোগ সুবিধা দেওয়ার নাম করে প্রতিভার স্বামী, পুত্র, পরিজনরা সমবায় ব্যাংক খুলে বিশাল অঙ্কের টাকা হাতিয়ে নেয়। ব্যাংক দেউলিয়া হয়। আমানতকারীরা পথে বসে। ক্ষমতাবলে 'প্রতিভা ব্যাংক' জালিয়াতির তদন্ত ধামাচাপা দেয় কংগ্রেস হাই কম্যান্ড। এই ঘটনায় বিদ্রোহ শুরু হয় মহারাষ্ট্র কংগ্রেসের অন্দরে। মহারাষ্ট্র থেকে সরিয়ে প্রতিভাকে রাজস্থানের রাজ্যপাল করে দেওয়া হয়। সেখান থেকে সোজা রাইসিনা হিলসে পদোন্নতি!

রাষ্ট্রপতি আবদুল কালাম আজাদের ব্যক্তিজীবন, তাঁর পাণ্ডিত্য, উৎকর্ষময় বিজ্ঞান সাধনা নিয়ে বলার মতো ধৃষ্টতা কারও নেই। ভারতের রাষ্ট্রপতি রূপেও তিনি যে স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করে গেছেন তাও একটা দৃষ্টান্ত। ঋষিতুল্য মানুষটি রাষ্ট্রপতি পদ থেকে অবসরের পর নিজস্ব ব্যবহৃত কিছু সামগ্রী নিয়েই রাষ্ট্রপতি ভবন ছেড়েছিলেন। আজ প্রতিভা পাটিল যেমন বিস্মৃত, কালাম স্যার কিন্তু এখনও ভারতীয় দিন যাপনে একইভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে আছেন।

এবার আসি ২০২২-এর রাষ্ট্রপতি নির্বাচন প্রসঙ্গে। এই নির্বাচনে শাসক দলের মনোনীত প্রার্থী ওড়িশার দ্রৌপদী মুর্মু। জনজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত দ্রৌপদীর শৈশব থেকেই লড়াই শুরু হয় দারিদ্রের সঙ্গে। জীবনে চলার পথে চরম আর্থিক অনটনের মধ্যেও উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছেন। তারপর রাজনীতির আঙিনায়

মনোনয়ন জমা দেওয়ার পথে দ্রৌপদী মুর্মু। সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী সহ অন্যান্য নেতা মন্ত্রী।

তাঁর প্রবেশ। প্রথমে পৌর নির্বাচন দিয়ে শুরু হয় দ্রৌপদী মুর্মুর জয়যাত্রা। তারপর বিধায়ক, মন্ত্রী, রাজ্যপাল। বিজেপির জনজাতি মোর্চার রাজ্য সভাপতির দায়িত্বও সামলেছেন তিনি। ২০১৫ সালে ঝাড়খন্ডের রাজ্যপাল নির্বাচিত হন। সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্ম হয়নি তাঁর। প্রতিবন্ধকতার সিঁড়ি ভেঙে সাফল্যের চূড়ায় উঠতে হয়েছে। কোনও গডফাদারও ছিল না। এদেশের জনজাতি ভাই-বোনদের প্রতিনিধি স্বরূপ দ্রৌপদী মুর্মুকে চয়ন করেছে মোদী সরকার। এই পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। এর ফলে ভারতের জনজাতি সমাজের একটা বৃহত্তর অংশের প্রভূত মানোন্নয়ন যেমন হবে, তেমনই শিক্ষা ও সচেতনতার প্রসার বাড়বে দ্রুতগতিতে। ভারতের ইতিহাসে চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে ২৪ জুন ২০২২ তারিখটি। যেদিন প্রথম জনজাতি মহিলা প্রার্থী হিসেবে রাষ্ট্রপতি পদের জন্য মনোনয়ন জমা দিলেন দ্রৌপদী মুর্মু। আর প্রস্তাবক হিসেবে স্বাক্ষর করলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী। সঙ্গে উপস্থিত রইলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী থেকে শুরু করে বড়ো বড়ো নাম। বিজেপি দলটার এটাই বড়ো গুণ। তারা যোগ্যতমের সম্মান করতে জানে। তাই চার্লস ডারউইনের ল' মেনে এই দলে যোগ্যতমের উদ্‌বর্তন ঘটে চিরকাল।

এ প্রসঙ্গে একবার অন্তত উত্তর-পূর্ব ভারতের কংগ্রেসের জনজাতি নেতা পি এ সাংমার কথা উল্লেখ করতে হচ্ছে। লোকসভার প্রাক্তন স্পিকার পূর্ণ অ্যাজিটক সাংমা ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। জীবনের বেশিরভাগ সময় কংগ্রেস থাকলেও পরবর্তীকালে তাঁর বোধোদয় হয়। তিনি বুঝতে পারেন, কংগ্রেস আমলে এদেশের জনজাতি মানুষেরা অবহেলিত থেকে গেছেন। ২০১২ তে কংগ্রেস যখন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রণব মুখোপাধ্যায়ের নাম ঘোষণা করছে, অন্যদিকে পি এ সাংমাও দলের বিরুদ্ধে গিয়ে অন্যতম প্রার্থী হিসেবে রাষ্ট্রপতি হওয়ার দৌড়ে শামিল হলেন। ফলস্বরূপ তাঁকে বহিষ্কার করেছিলেন সোনিয়া গান্ধী। চির উন্নাসিক কংগ্রেসে এমনটাই প্রথা। কিন্তু বিজেপি কোনও ব্যক্তিকেন্দ্রিক দল নয়। মেধা, যোগ্যতা এবং মানবিক সত্তার মূল্যায়ন করেই এখানে পদাধিকারী নির্বাচিত করা হয়। জাতপাতের ঊর্ধ্বে উঠে মানুষকে সম্মান দেওয়ার এমন উদাহরণ অতীতেও প্রচুর আছে। আজ যেমন দ্রৌপদী মুর্মুকে যোগ্য সম্মান দিল মোদী সরকার। অথচ বিরোধী জোটের প্রার্থী জোটাতে গিয়েই নাকাল অবস্থা। প্রথমে শরদ পওয়ার বললেন 'না'। গোপালকৃষ্ণ গান্ধী নিমরাজি ছিলেন। তৃণমূল সুপ্রিমো মমতার জোরাজুরিতেই তাঁর কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল। মহাত্মা গান্ধীর 'দৌহিত্র' পত্রপাঠ তা নাকচ করেছেন। ফারুক আবদুল্লাও দৌড় থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন। সবশেষে বিরোধী জোটের মান রক্ষা করে মনোনয়নপত্র জমা পড়েছে যশবন্ত সিনহার। ১৮ দলের বিরোধী গোষ্ঠীর রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী যশোবন্ত এখন তৃণমূল কংগ্রেসের ন্যাশনাল ভাইস প্রেসিডেন্ট। আইএএস হিসেবে কর্মজীবন শুরু করা যশবন্ত সিনহা পরবর্তীকালে রাজনীতিতে আসেন। জনতা দলের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন তিনি। রাজ্যসভার সাংসদ হন। ১৯৯৬ সালে বিজেপিতে আসেন। ১৯৯৮-এ তাঁকে বিদেশ মন্ত্রী করে বিজেপি। ২০১৪ সালে মোদী সরকারের মন্ত্রীসভায় মন্ত্রী হতে চেয়েছিলেন। বিফল মনোরথ হয়ে দলের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করেন। তারপর ২০১৮-য় তৃণমূল কংগ্রেসে তাঁর পদার্পণ। মমতার দলে ঢোকা ইস্তক তাঁর একটাই অ্যাজেন্ডা--- মোদী সরকারের সমালোচনা। দেশের অগ্রগতিতে তিনি কোনও চড়াই দেখতে পাচ্ছেন না। এহেন জাতীয় নেতাকে পেয়ে তৃণমূল জাতীয় ক্ষেত্রে হালে পানি পাওয়ার স্বপ্ন দেখছে!

যাই হোক, হালফিলের ভারতীয় আমজনতা বেশি সমালোচনা শুনতে চান না। তাঁরা চাক্ষুস করতে চান। সবকিছুর গুণাগুণ পরখ করে, মাপকাঠিতে তুল্যমূল্য বিচার করতে চান। ২০১৪-য় দিল্লির মসনদে বসে দুহাত বাড়িয়ে নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন 'সবকা সাথ',সবকা বিকাশ'। দেশবাসীর প্রতি সেই প্রতিশ্রুতির সার্বিক প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে প্রতিটি ক্ষেত্রে। সাম্প্রতিক কালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নিজেকে দেশের সেবক প্রতিপন্ন করেছেন। তাই ভূ-ভারতের আপামর জনসাধারণের সবার বিশ্বাস অর্জন করে দ্বিতীয় দফায় এককভাবে সরকার গঠন করতে সমর্থ হয়েছেন। এখানেই অন্য দলগুলোর থেকে স্বতন্ত্র ভারতীয় জনতা পার্টি। সেই নিরিখে দ্রৌপদী মুর্মুর পাল্লা অনেকটাই ভারী। বড়ো কোনও অঘটন না ঘটলে ভারতের প্রথম জনজাতি রাষ্ট্রপতি হবেন দ্রৌপদী মুর্মু। এই দৌড়ে শিবির বদলানো যশবন্ত সিনহা এখন অনেক দূরে। ■

ফঃ ৪

গোপালীতে ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের জৈব প্রশিক্ষণ শিবির ও যোজনা বৈঠক

জমিতে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার করার ফলে উৎপাদিত ফসলে মিশে যায় বিষ। খাবারে মিশে থাকা বিষে মানুষ আজ নানাপ্রকার মারণ রোগের শিকার। বেড়ে চলা ক্যানসার ও অন্যান্য মারণ রোগের হাত থেকে রক্ষা পেতে গেলে অবিলম্বে রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার বন্ধ করা প্রয়োজন। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে মেদিনীপুরের গোপালীতে গত ১৪ ও ১৫ মে ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের উদ্যোগে জৈব কৃষি প্রশিক্ষণ শিবিরের এবং ১৬ মে একদিনের যোজনা বৈঠকের আয়োজন করা হয়। । কিষাণ সঙ্ঘের পতাকা উত্তোলন ও প্রদীপ প্রজ্বলন করে বর্গের শুভারম্ভ করেন প্রাদেশিক সহ সভাপতি আশিস সরকার। উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন অখিল ভারতীয় সম্পাদক ভানু থাপা। জৈব কৃষির বাস্তবতা এবং কিষাণ সঙ্ঘের অভিমুখ আলোচিত হয় তাঁর বক্তব্যে।

দুদিনের এই প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশগ্রহণ করেন বিভিন্ন জেলা থেকে আগত ৬০ জন কৃষক কার্যকর্তা। উপস্থিত কৃষকদের হাতেকলমে প্রশিক্ষণ দেন জৈব বিশেষজ্ঞ ও কৃষিবিদ ড. অনুপম পাল, হুগলীর চুঁচুড়া কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধিকর্তা ড. আশুতোষ মণ্ডল, হাওড়া জেলার যুগ্ম কৃষি প্রশিক্ষণ অধিকর্তা হৃষীকেশ মণ্ডল এবং আইআইটি খড়্গপুরের অধ্যাপক রাজেন্দ্র প্রসাদ মানসভরম।

জৈব কৃষির প্রয়োজনীয়তা, জৈব চাষ পদ্ধতি, উৎপাদন মূল্য, জৈব চাষের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বিষয়ে আলোকপাত করেন ড. পাল। জৈব পদ্ধতিতে বীজ উৎপাদনের পদ্ধতি এবং তার সংরক্ষণ কীভাবে করতে হবে সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন ড. আশুতোষ মণ্ডল। কৃষিবিদ হৃষীকেশ মণ্ডল গাছের খাদ্য উপাদানে অনুখাদ্যের অভাবজনিত লক্ষণ ও তার প্রতিকার এবং জৈব সার তৈরির পদ্ধতি বিষয়ে আলোচনা করেন। অধ্যাপক মানসভরম জৈব চাষের উপযোগী কৃষি যন্ত্রপাতির বিষয়ে আলোকপাত করেন।

তিনদিনের প্রশিক্ষণ শিবির এবং যোজনা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কিষাণ সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় সংগঠন সম্পাদক দীনেশ কুলকার্নি, অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর সদস্য ও পশ্চিমবঙ্গ প্রান্তের সভাপতি কল্যাণ কুমার মণ্ডল ও পশ্চিমবঙ্গের সংগঠন সম্পাদক অনিল চন্দ্র রায়। প্রশিক্ষণ শিবিরের ব্যবস্থাপনায় ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ সম্পাদক অনিমেষ পাহাড়ি।

বাবুইজোড়ে শ্রদ্ধার শ্রদ্ধাজ্ঞাপন অনুষ্ঠান

গত ১২ জুন বীরভূম জেলার প্রখ্যাত সামাজিক সংস্থা শ্রদ্ধার পক্ষ থেকে বাবুইজোড় গ্রামের সরস্বতী শিশুমন্দিরে সংস্কৃতভারতীর মধ্যবঙ্গ প্রান্তের সহ প্রান্ত শিক্ষণ প্রমুখ দেবাশিস কর্মকারের ৮৪ বছর বয়সি ঠাকুরদা শ্রী নারায়ণ চন্দ্র কর্মকারকে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। শ্রদ্ধার সদস্যরা নারায়ণ কর্মকারকে পত্র, পুষ্প, উত্তরীয় ফল, মিষ্টান্ন ও মানপত্র দিয়ে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন। পৌত্র দেবাশিস কর্মকার ঠাকুরদা সম্পর্কে নিজের অনুভব এবং সমাজে গুরুজনদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। শ্রদ্ধার উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে আলোকপাত করেন শ্রদ্ধার বিশিষ্ট কর্মকর্তা বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে একই সঙ্গে হিন্দু সাম্রাজ্যদিনোৎসব পালিত হয়। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন শ্রদ্ধার সদস্য তথা সিউড়ীর বেণীমাধব উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক পতিতপাবন বৈরাগ্য। সমাপ্তি বক্তব্য রাখেন শ্রদ্ধার সম্পাদক

লক্ষ্মণ বিষ্ণু। অনুষ্ঠানে কর্মকার পরিবারের আত্মীয়স্বজন এবং শতাধিক গ্রামবাসী উপস্থিত ছিলেন।

হাওড়ায় অঙ্কন, সংগীত ও নৃত্য প্রতিযোগিতা

স্বাধীনতার ৭৫তম উদ্‌যাপন সমিতি, হাওড়া মহানগরের উদ্যোগে গত ১৯ জুন হাওড়া ময়দানের মারিয়াজ ডে স্কুলে স্কুল পড়ুয়াদের জন্য অঙ্কন, সংগীত ও নৃত্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। বিষয়বস্তু সবই ছিল দেশাত্মবোধক। প্রতিযোগিতায় প্রথম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ২৫০ জনেরও বেশি প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগী, তাদের অভিভাবক ও বিশিষ্টজনদের উপস্থিতিতে সারাদিন স্কুল ভবন ও তার প্রশস্ত প্রাঙ্গণ উৎসবমুখর ছিল। সমিতির সভাপতি রথীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী সকালে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। বন্দেমাতরম্ রাষ্ট্রগীত পরিবেশন করেন তনুশ্রী মল্লিক। বিকেলে সমবেত জাতীয় সংগীত ও পতাকা অবতরণ করে সমিতির সম্পাদক অমিত সাঁতরা জানান, 'জুলাইয়ে বক্তৃতা, প্রবন্ধ ও কুইজ উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।' প্রাদেশিক সমিতির সম্পাদক সুব্রত ভৌমিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

মেদিনীপুরে সংস্কার ভারতীর নজরুল জয়ন্তী উদ্‌যাপন

সংস্কার ভারতী, মেদিনীপুর শাখা গত ২৬ মে মেদিনীপুর শহরের বিদ্যাসাগর স্মৃতি মন্দিরে কাজী নজরুল ইসলামের ১২৩ তম জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন করে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মৃগাঙ্কশেখর মাইতি। প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ রবিশঙ্কর ভট্টাচার্য। বিশেষ অতিথি রূপে ছিলেন শ্যামল মণ্ডল, লহর মজুমদার, অনিল ঘোষ, জগমোহন আচারিয়া প্রমুখ। ছিলেন সংস্কার ভারতীর জেলা সভাপতি পূর্ণেন্দু মাঝি। এছাড়া ছিলেন জেলা সংযোজক কনক পাণিগ্রাহী, সহ সম্পাদক মিতা ঘোষ, পুলক বর্মন প্রমুখ।

মন্ত্র-সহ প্রদীপ প্রজ্বলন, অতিথি বরণ ও নৃত্য সহযোগে ভাবসংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয়। আবৃত্তি, নৃত্য, সংগীত, গীতিআলেখ্য ও কবিতাপাঠের মাধ্যমে কবির জন্মদিন স্মরণ করা হয়।

একক সংগীত পরিবেশন করেন অদ্রিজা দত্ত, মিতা ঘোষ, শান্তনু হালদার, পম্পা মিত্র, পম্পি খামরুই, জয়া মাজি, বন্দনা চক্রবর্তী, ইন্দ্রাণী দাশগুপ্ত ও তাঁর ছাত্র-ছাত্রীরা। সুপ্রিয়া দাস ও নবনীতা বসুর ছাত্রীরা নৃত্য পরিবেশন করেন। গীতিআলেখ্য সম্পাদনা করেন অঞ্জন মান্না ও মিতা ঘোষ। দীপেশ দে, সবিতাব্রত রায় এবং ভারতী ব্যানার্জি ও তাঁর ছাত্র-ছাত্রীরা সংগীত পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানের সংযোজন ও সঞ্চালনায় ছিলেন দীপান্বিতা জানা ও তপন সামন্ত। □

লোকপ্রজ্ঞা সিউড়ী চর্চাকেন্দ্রের উদ্যোগে আলোচনা চক্র

গত ২৬ জুন বীরভূম জেলার লোকপ্রজ্ঞা সিউড়ী চর্চাকেন্দ্রের উদ্যোগে অরবিন্দ পল্লী সরস্বতী শিশুমন্দিরে এক আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আচার্য গৌড়ীয় মঠের মঠাধ্যক্ষ শ্রীমৎ তমালকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, প্রধান অতিথি রূপে মাইকেল মধুসূদন কলেজের অধ্যাপক শ্রীরাজ রাজ মুখোপাধ্যায়। ছিলেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামী সত্যশিবানন্দ মহারাজ, স্বাধীনতা-৭৫ উদ্‌যাপন সমিতির দক্ষিণ বীরভূম জেলার সম্পাদক প্রহ্লাদ মণ্ডল, মধ্যবঙ্গ প্রান্তের সম্পাদক শিবাজীপ্রসাদ মণ্ডল। প্রধান আলোচক হিসেবে ছিলেন প্রজ্ঞাপ্রবাহ পূর্বক্ষেত্রের সংযোজক অরবিন্দ দাশ। আলোচনার মাঝে মাঝে দেশাত্মবোধক সংগীত ও নৃত্য পরিবেশিত হয়। শিশুরা নিজেদের হাতে আঁকা ছবি প্রদর্শন করে। সংস্কার ভারতী সিউড়ী শাখা সমবেত সংগীত পরিবেশন করে। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন শিক্ষক ও বিশিষ্ট সমাজসেবী পরিতোষ হাজরা। শ্রীমতী মালা দাসের কণ্ঠে বন্দেমাতরম্ পরিবেশনের পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

কেশিয়াড়ী সরস্বতী প্রশিক্ষণ মন্দিরে আধারভূত বিষয়ে কর্মশালা

গত ২৩ থেকে ২৬ জুন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সরস্বতী প্রশিক্ষণ মন্দিরে পূর্বক্ষেত্রের (সিকিম, উত্তরবঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ ও ওড়িশা) পাঁচ আধারভূত বিষয়ের (শারীরিক, যোগ, সংগীত, সংস্কৃত এবং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক) এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালার উদ্বোধন করেন বিদ্যাভারতীর পূর্বক্ষেত্রের সংগঠন সম্পাদক দিবাকর ঘোষ। তিনি বলেন, আমাদের লক্ষ্যকে পূর্ণ করার জন্য বিদ্যাভারতীর পাঁচ আধারভূত বিষয়ের ক্ষেত্রীয় কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। এখানে আমরা আমাদের প্রতিটি বিষয়ের বার্ষিক কার্যযোজনাও তৈরি করব।

কর্মশালায় বিদ্যাভারতীর অখিল ভারতীয় সহ সংগঠন সম্পাদক যতীনজী এবং পূর্বক্ষেত্রের সহ সংগঠন সম্পাদক পার্থ ঘোষ উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা প্রতিটি বিষয়ের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করেন। কর্মশালায় আগত সকলেই বিষয়গুলিকে নিজ নিজ প্রান্তের শিশুমন্দিরগুলিতে প্রয়োগের প্রতিশ্রুতি দেন। কর্মশালার সমাপ্তি অধিবেশনে তারক দাস সরকার বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, প্রতিটি বিষয়ের ওপর সমান গুরুত্ব দিয়ে প্রয়োগ করতে হবে। কোনো বিষয়কেই কম গুরুত্বপূর্ণ ভাবা চলবে না। বন্দেমাতরম্ সংগীতের মাধ্যমে কর্মশালার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

কঠ গণরাজ্যর চণ্ডীবাহিনীর হাতে শোচনীয় পরাজয় আলেকজান্ডারের

পৃথ্বীশ সেন

কঠ গণরাজ্য পঞ্জাব প্রদেশ। সিন্ধু নদীর তীরে। ৩২৫ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ। তৎকালীন পঞ্জাবের শেষ প্রান্তে তখন ছিল কঠ গণরাজ্য। সেই রাজ্যের রানি কার্বিকা। রানি ঠিক নন অবশ্য, তিনি আসলে রাজকুমারী। ছোটোবেলায় তাঁর বাবা-মা মারা যান। তিনি হন ভাবি রানি। তাকে সিংহাসনে বসিয়ে রাজত্ব চালাতেন মন্ত্রী। ছোটোবেলা থেকেই তিনি শিখেছেন বিভিন্ন রাজকাজের খুঁটিনাটি। শস্ত্র ও শাস্ত্র— দুই শিক্ষা হয়েছে তার সমানতালে। কুলগুরুর কাছে শিখেছেন সমস্ত পাঠ— বেদ শিক্ষা। শাস্ত্র শিক্ষা। তখন সাধারণ ঘরের মহিলারা খুব একটা অস্ত্রশিক্ষা করতেন না। তার ফলে নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য তারা পুরুষদের উপর নির্ভর করতেন। আত্মবিশ্বাসের অভাব ছিল তাদের মধ্যে। রাজকুমারী কার্বিকা একটু বড়ো হতেই বুঝলেন এই সময়ে মহিলাদের সমর শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা। তিনি বিশেষ আইনের মাধ্যমে রাজ্যের মহিলাদের জন্য বাধ্যতামূলক করলেন অস্ত্র শিক্ষা। সেই উদ্দেশ্যে নিয়োগ করা হলো বিভিন্ন অস্ত্র শিক্ষাবিদ। রাজ্যের মহিলারা সানন্দে অংশ নিলেন। বিভিন্ন বিষয়ে চলল মহিলাদের শিক্ষাগ্রহণ— তির ধনুক, তিরের মুখে আগুন/বিষ লাগিয়ে লক্ষ্যভেদ, বর্শার মুখে বিস্ফোটক লাগিয়ে সঠিক লক্ষ্যভেদ। বিভিন্ন বিষ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান। গুলতির মাধ্যমে ছোটো ধারালো পাথর সঠিক লক্ষ্যে নিক্ষেপ করা। দড়ির ফাঁসের প্রয়োগ, চোখে পট্টি বেঁধে অস্ত্রচালনা। বাতাসের গতি, শব্দ, গন্ধ ইত্যাদি মাথায় রেখে অস্ত্রের লক্ষ্যভেদ, বিনা অস্ত্রে, খালি হাতে শত্রুর মোকাবিলা, ঘোড়ায় চড়ে অস্ত্র চালনা শিক্ষা।

প্রকৃতির বিভিন্ন জিনিস যেমন গাছের ডাল, ঝুরি, মূল ইত্যাদি কাজে লাগিয়ে শত্রুর মোকাবিলা। পাথর, দড়ি ইত্যাদির প্রয়োগ। অস্ত্রশিক্ষার সমস্ত পর্যায় অতিক্রম করলেন মহিলারা। শিক্ষা শেষে উপযুক্ত মহিলাদের নিয়ে বানানো হলো এক ভয়ানক যোদ্ধা বাহিনী। মহিলা বাহিনী। নাম হলো চণ্ডী বাহিনী। নেতৃত্বে রাজকুমারী কার্বিকা। তিনি নিজেও সাক্ষাৎ চণ্ডী। প্রায় ছয় ফুট তার উচ্চতা। উজ্জ্বল সূর্যের মতো তার গায়ের রং। দুই হাতে দুই তরোয়াল নিয়ে যখন তিনি নামতেন ময়দানে, তখন মনে হতো সাক্ষাৎ চণ্ডীর আগমন ঘটেছে।

রাজকুমারী ছিলেন প্রজাদের প্রিয়। তিনি মাঝে মাঝেই রাজ্যে ঘুরে ঘুরে সকলের অভাব অভিযোগ শুনতেন। সেই অনুযায়ী সমাধান করতেন। এই সব কারণে তাঁর রাজ্যের শক্তি দিন দিন বেড়ে উঠেছিল। রাজ্য উন্নতির শিখরে পৌঁছে যাচ্ছিল। রাজ্যে ছিল খুশির পরিবেশ। তাঁর রাজ্যে আলাদা করে সেনাবাহিনী ছিল না। প্রজারাই ছিল তাঁর সেনা। এক এক অঞ্চলের কিছুজন পাহারা দেবে। বাকিরা করবে প্রতিদিনের কাজ, কিছুদিন পরে যারা পাহারা দিচ্ছিল, তারা কাজে নামবে। অন্যদল আসবে পাহারায়। প্রতিদিনের কাজের শেষে বিকেলে কিছুটা সময় সকলকেই করতে হতো অস্ত্র শিক্ষা, অনুশীলন। এইভাবে তার রাজ্যে সকলেই হয়ে উঠেছিল এক একজন অনন্য সেনানী। সঙ্গে সুনাগরিক। তাঁর এই অনন্য নীতির জন্য আশেপাশের শত্রুরা তাঁকে সমীহ করে চলত।

কিন্তু রাজ্যে শান্তি বেশিদিন স্থায়ী হলো না। খবর এসেছে আলেকজান্ডার আসছে। সুদূর গ্রিস থেকে। বিশ্বজয়ী হওয়ার ইচ্ছে নিয়ে। ভারত দখল তার লক্ষ্য। তারপরে পৃথিবীর ইতিহাসে বিশ্বজয়ী সম্রাট হিসেবে নাম লেখাবে। কঠ রাজ্যের থেকে কয়েক মাইল দূরে বিশাল শিবির পড়েছে তার। খবর আসছে প্রায় আশি হাজার মতান্তরে এক লক্ষ সেনা রয়েছে আলেকজান্ডারের বাহিনীতে। এখন তাদের লক্ষ্য কঠ গণরাজ্য। আরও একদল সেনা রয়েছে আলেকজান্ডারের। তবে তারা অনেক দূরে রয়েছে। তারাও প্রায় লাখ খানেক।

আলেকজান্ডার কয়েক দিনের মধ্যেই আক্রমণ করবে কঠ গণরাজ্য। গুপ্তচর মারফৎ এই খবর পেয়েই সক্রিয় হয়ে উঠলেন কার্বিকা। আর দেরি নয়। ওদের গুছিয়ে উঠার আগেই আক্রমণ করতে হবে। চণ্ডীসেনা জমায়েত করা হলো। সেখানে রয়েছে ৩৫০০ সেনার সঙ্গে ১৫০০ অশ্বারোহী বাহিনী। রয়েছে আরও ৩৫০০ পদাতিক সেনা। সব মিলিয়ে ৮৫০০ চণ্ডী সেনা। চণ্ডী সেনা চারটি দলে ভাগ করা হলো। দায়িত্ব নিলেন জয়া, সৌরিমিনি, মৃদুলা,গরিণ্য। প্রজারাও এল যুদ্ধে। সব মিলিয়ে সৈন্য সংখ্যা হলো এক লক্ষ বিশ হাজার, মতান্তরে এক লক্ষ ষোলো হাজার।

কার্বিকা জানতেন এ এক অসম যুদ্ধ। কিন্তু কীভাবে কী করা যায়।

যুদ্ধ কৌশল সাজাতে হবে। অনেক ধৈর্য সহকারে সারাদিন ধরে চলল পরিকল্পনা। চক্রব্যূহ সাজাতে হবে। এমন ফাঁদ যাতে আলেকজান্ডার বেরুতে না পারে। সেদিন সারারাত ধরে চলল পরিকল্পনা। পরিকল্পনা অনুযায়ী চারশো তিরন্দাজী পাঠানো হলো। তারা আলেকজান্ডার শিবিরের পাশের পাহাড়ের উপরে লুকিয়ে পড়ল। তাদের সঙ্গে বিভিন্ন ক্ষেপণাস্ত্র।

ভোর হচ্ছে। গ্রিক সেনারা উঠছে ঘুম থেকে। জমায়েত হচ্ছে ছোটো ছোটো জটলায়। সঙ্গে সঙ্গে ইশারা হলো। একসঙ্গে ছুটল কয়েকশো আগুনে তির। নির্ভুল লক্ষ্যে আঘাত হানল অপ্রস্তুত সৈন্যদের উপরে। কিছু বুঝে উঠার আগেই এল আরও ঝাঁক ঝাঁক তির। শত শত গ্রিক সেনা মারা পড়ল। জ্বলছে তাদের শিবির। শুরু হয়ে গেছে চিৎকার। জ্বলন্ত শিবির থেকে প্রাণ বাঁচিয়ে বেরোতে গিয়ে মারা গেল আরও কয়েকশো সেনা। দেখতে দেখতে বিছিয়ে গেল লাশের পর লাশ। এই যুদ্ধরীতি পরে পরিচিত হয় lure the tiger out of den অর্থাৎ বাঘকে তার গুহার বাইরে আসতে বাধ্য করা। বর্তমানে এটি গেরিলা যুদ্ধনীতির খুব প্রিয় এক কৌশল।

খবর গেল আলেকজান্ডারের কাছে। সেনাপতিদের নির্দেশ দিলেন তিনি কঠ গণরাজ্য আক্রমণ করতে। প্রায় চল্লিশ হাজার সেনা চলল কঠ রাজ্যের দিকে। এদিকে সরু পথের দু'পাশে পাহাড়ের উপরের জঙ্গলে লুকিয়ে রয়েছে চণ্ডী সেনা। সারাটা পথ জুড়ে আক্রমণ চলল গেরিলা যুদ্ধ কায়দায়। পাহাড়ের উপর থেকে বড়ো পাথর, বড়ো বড়ো গাছ এসে পড়তে লাগল। সঙ্গে তির, বর্শা। কখনও আগুনে তির কখনো বিষ তির। চলতে লাগলো গুলতির মাধ্যমে ধারালো পাথরের বৃষ্টি। আলেজান্ডার বাহিনীর কাঁচিকলে পড়া দশা। গ্রিক সৈন্য মারা পড়েছে। রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে দুদিকেই। বাকিরা পালাতে পরছে না। তাদের উপর তির বর্শা পাথরের চলছে অনর্গল বৃষ্টি। মোটামুটি এসব পেরিয়ে যখন বাহিনী কঠ প্রদেশের কাছাকাছি, পৌঁছল তখন সৈন্য প্রায় অর্ধেক। বেশিরভাগ পথেই মারা গিয়েছে। যে কজন পৌঁছেছে তাদের বেশিরভাগ আহত।

এরপর এক বিশেষ কৌশল নিল চণ্ডী বাহিনী। বিশেষ ধরনের চুঙ্গি ব্যবহার করে অদ্ভুত একরকম আওয়াজ তুলল তারা। চারপাশের পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে সেই আওয়াজ যখন ফিরে এল, মনে হতে লাগলো যেন বহু বহু হাজার সৈন্য রয়েছে সেই জায়গা জুড়ে। এই অদ্ভুত আওয়াজে রীতিমতো বিভ্রমে পড়ে গেল গ্রিক বাহিনী। তারা সেই আওয়াজ লক্ষ্য করে এগিয়ে গেল। পেছনে রইল বাহিনীর একাংশ।

এই সময়ে নেওয়া হলো ঊর্মি যুদ্ধ কায়দা। এই যুদ্ধ কায়দায় সমুদ্রের ঢেউ তিরে আছড়ে পড়ার মতো বারে বারে আক্রমণ করা হয়। এই ভাবে আক্রমণ করলে সঠিকভাবে বোঝা যায় না শত্রু সংখ্যা ঠিক কত। দুই ভাগে বাহিনী ভাগ হতেই শুরু হলো আবার আক্রমণ। মাঝে ফেলে দেওয়া হলো বেশ কিছু পাথর ও গাছ। সব মিলে গ্রিক সেনাবাহিনী নাকাল অবস্থায়। দিশেহারা হয়ে গেল তারা। সেনাপতি সমেত এই বাহিনীর শোচনীয় পরাজয় হলো। বন্দি করে নেওয়া হলো সেনাপতি সমেত কিছু বিশেষ সেনাপ্রধানকে।

এরপরে বিশাল বাহিনী নিয়ে এলেন আলেকজান্ডার নিজে। কিন্তু বিধি বাম। বেশ কিছু সৈন্য পথেই মারা পড়ল। আলেকজান্ডার যত এগোল তত দেখতে পেল লাশ। লাশের পর লাশ। আগে যে বাহিনী গিয়েছে তাদের অবস্থা শোচনীয়। ভয়ের সঞ্চার হলো তাদের মনে। রাস্তায় আহত বহু সৈনিক পড়ে রয়েছে। তাদের চিকিৎসা দরকার। বাহিনীর বেশ কিছু সৈন্য সেই আহত সৈন্যদের চিকিৎসায় লেগে পড়ল। মোটামুটি আহত সেনাদের সরিয়ে নেওয়ার পর শুরু হলো সামনাসামনি লড়াই। এমন সময় হঠাৎ করে চণ্ডী সেনা আক্রমণ করে মুহূর্তে মিলিয়ে গেল।

কখনো এদিক থেকে। কখনো ওদিক থেকে। আলেকজান্ডার বাহিনীকে পেছনের দিক থেকে শেষ করা চলতে থাকে। একের পর এক আক্রমণে গ্রিক সেনাবাহিনীর মনোবল ভেঙে ফেলা হয়। সংখ্যায় কমতে থাকে তারা দ্রুত।

উপায়ন্তর না দেখে আলেকজান্ডার সন্ধির বার্তা পাঠালেন। ওদিক থেকে বার্তা এল রানির সঙ্গে আলেকজান্ডরের হোক দ্বন্দ্বযুদ্ধ। যে জিতবে তার শর্ত মেনে নেবে অপরপক্ষ। উপায় ছিল না আলেকজন্ডারের। শোনা যায় অনেক চেষ্টা করেন আলেকজান্ডার তার বাহিনীর সেরা লড়াকুর সঙ্গে রানি বাহিনীর সেরা লড়াকুর মধ্যে লড়াইয়ের জন্য। কিন্তু রানির একই কথা।

শেষে আলেকজান্ডারকে নামতে হলো যুদ্ধের ময়দানে। শুরু হলো সম্মুখ সমর। ভয়ানক সেই যুদ্ধে আলেকজান্ডার দাঁড়াতে পারেননি বলে জানা যায়। দু' হাতে তলোয়ার নিয়ে রাজকুমারী কার্বিকা যেন সাক্ষাৎ চণ্ডী। বিদ্যুৎ গতিতে সেই তলোয়ার সবার আগে আঘাত হানল আলেকজান্ডরের হাতে। ঢাল পড়ে যায় আলেকজান্ডারের হাত থেকে। সঙ্গে সঙ্গে মাথায় তলোয়ারের বাঁটের প্রচণ্ড আঘাতে ছিটকে পড়েন আলেকজান্ডার। অপেক্ষা করেন রাজকুমারী। আলেকজান্ডার আবার উঠলে যুদ্ধ শুরু হয়। এবারে রানির তলোয়ার আঘাত করে তার পেটে। বেরিয়ে পড়ে অন্ত্র। পরাজয় স্বীকার করেন আলেকজান্ডার।

শর্ত অনুযায়ী বহু অর্থ দিতে হয় জরিমানা। কথা দিতে হয় আর কখনো সে আক্রমণ করবে না কঠ রাজ্য। এই মর্মে সন্ধি করে বাকি সেনা নিয়ে আলেকজান্ডার ফিরে যান। তখন আলেকজান্ডারের কাছে ছিল মাত্র তিরিশ হাজার সেনা। ত্রিশ হাজারের মধ্যে বেশিরভাগ আহত।

চণ্ডী সেনার প্রায় ২৮০০ জন মারা যায় বলে জানা যায়। মারা যান চণ্ডী বাহিনীর চার প্রধান— জয়া, গরিণ্য, সৌরিমিনি ও মৃদুলা। এই ঘটনার পরে আলেকজান্ডার ছ' মাসের বেশি তার শিবিরে বসে থাকেন বলে জানা যায়।

রাজকুমারী কার্বিকার সঙ্গে আলেকজান্ডারের এই যুদ্ধের বর্ণনা পাওয়া যায় বিভিন্ন পুরোনো দস্তাবেজে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে Hellenistic Babylonial Political History of Ancient India— রায়চৌধুরী।

এরপরে কী হয়েছে সেই নিয়ে দ্বিমত হয়েছে। একদল বলেন, আলেকজান্ডার শর্ত মেনে কখনও আসেননি আর কঠ গণরাজ্য আক্রমণ করতে। তিনি ভারতে প্রবেশ করেন তক্ষশীলা দিয়ে। আরেকদল বলেন যে— একদিন আলেকজান্ডার তার অবশিষ্ট কয়েক লক্ষ সেনা নিয়ে অতর্কিতে আক্রমণ করেন কঠ গণরাজ্য। তবে গণরাজ্যের স্বাভিমানী প্রজারা কেউ আত্মসমর্পণ করেননি। অসম যুদ্ধে সামনাসামনি লড়াই করে মৃত্যুবরণ করেন সকলে। বাহিনীর নেতৃত্ব দিতে দিতে রাজকুমারী কার্বিকাও মারা যান এই যুদ্ধে। কঠ গণরাজ্য লুট করে বিনষ্ট করা হয়। তারপর এই পথ ধরেই তক্ষশীলা প্রবেশ করেন আলেকজান্ডার।

আলেকজান্ডারকে মহান প্রতিপন্ন করতেই এই বীরত্বের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেননি তথাকথিত ঐতিহাসিকরা।

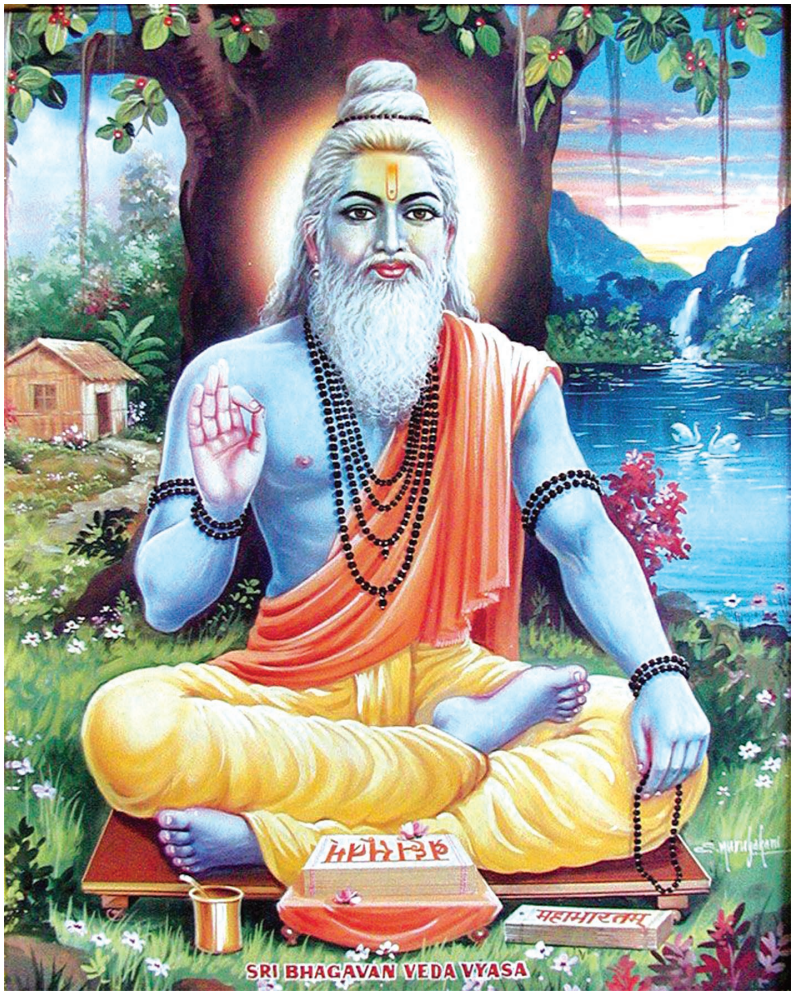

শ্রীগুরুপূর্ণিমায় পরম গুরু বেদব্যাসের প্রতিই শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়

বিদ্রোহী কুমার সরকার

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, 'যদি পৃথিবীর মধ্যে এমন কোনও দেশ থাকে, যাকে পুণ্যভূমি বলা যায় তবে নিশ্চিত সেই দেশ আমাদের মাতৃভূমি এই ভারতবর্ষ।' ভারত আধ্যাত্মিকতার পীঠভূমি। এর সভ্যতা অন্য কোনও পাশ্চাত্য সভ্যতার মতো অন্য কোনো সভ্যতাকে বা সংস্কৃতিকে গ্রাস করে বা বাহুবল ও বুদ্ধিবলের প্রভাবে বিস্তৃত হয়নি। এর সভ্যতা গড়ে উঠেছে আধ্যাত্মিকতাকে কেন্দ্র করে। নানা সভ্যতা ও সংস্কৃতির পলিমাটি দিয়ে স্তরে স্তরে এই সংস্কৃতির পীঠভূমি যা অত্যন্ত পবিত্র তা গড়ে উঠেছে। এখানে সকলে বসবাস করেছে কিন্তু কাউকে নির্মূল করে বা কাউকে ছাপিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য নিয়ে নয়। এই পবিত্রভূমিতেই ভগবান মৈত্রী ও করুণার বীজ বপন করে সকল সংস্কৃতির মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছেন। যা অন্য কোথাও দেখা যায় না।

এই পবিত্রভূমিতেই প্রাচীনকাল থেকে সংস্কৃতি ও কৃষ্টির ধারাকে রক্ষা ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করে এসেছেন অগণিত আধ্যাত্মিক গুরু বা পথপ্রদর্শক আচার্য। তাঁদের গুরুধর্ম রূপায়ণে মূল রূপকার, আধ্যাত্মিক জগতের প্রবক্তা ও বৈদিক সভ্যতার প্রথম আচার্য হলেন মহর্ষি বেদব্যাস। শাস্ত্রে তাঁকে ভগবানের স্বয়ং অবতার বলা হয়েছে--- যিনি অবতরিত হয়েছিলেন লোকশিক্ষার জন্য। তাঁর জন্মতিথিই হলো গুরুপূর্ণিমা বা ব্যাস পূর্ণিমা। আষাঢ় মাসের পূর্ণিমাই হলো এই পুণ্যদিন। এই দিনেই বিদ্যার্থীরা দ্বিজত্ব লাভের আশায় গুরুকুলে প্রবেশ করে গুরুর সান্নিধ্য থেকে জ্ঞান লাভের আশায় যাত্রা করত। উপনয়ন সংস্কারের মাধ্যমে তাদের দ্বিজত্ব প্রাপ্তি হতো। এই পুণ্যতিথিতেই হিন্দুরা তাদের নিজ নিজ দীক্ষাগুরুর আরাধনার মাধ্যমে পরমগুরু বেদব্যাসের প্রতিই শ্রদ্ধার্ঘ জ্ঞাপন করেন।

আচার্য শঙ্কর ও স্বামী বিবেকানন্দ 'বেদ' অর্থে জ্ঞানকে এবং 'ব্যাস' অর্থে উপাধিকে ধরেছেন। কাজেই বেদব্যাস হলেন 'জ্ঞানময় বিগ্রহ'। তাঁর মধ্যে ছিল সচ্চিদানন্দের প্রকাশ। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় গুরু সচ্চিদানন্দ রূপের প্রকাশ। 'সচ্চিদানন্দ গুরু' হওয়া সত্ত্বেও যাঁর মধ্যে এই ঈশ্বর তথা সচ্চিদানন্দের প্রকাশ বেশি তাঁকেই জীবনের ধ্রুবতারা ধরে আমরা তাঁর নির্দেশিত পথে অগ্রসর হই বা হওয়ার চেষ্টা করি।

সূর্যের আলো সবকিছুর উপরই প্রতিফলিত হয় কিন্তু চাঁদে তার প্রকাশ বেশি। আবার পূর্ণিমার দিনে তা হয় সবথেকে বেশি। এখানেই তো পূর্ণিমার গুরুত্ব। প্রতি মাসেই পূর্ণিমা আসে। প্রতিটি পূর্ণিমার নিজস্ব গুরুত্ব আছে। গোরুর দুধ দেহের সর্বত্রই থাকে কিন্তু স্তনে তার প্রকাশ সব থেকে বেশি। গঙ্গার জল পবিত্র কিন্তু বিশেষ বিশেষ ঘাটেই তার পবিত্রতার প্রকাশ বেশি। এই গুরুপূর্ণিমা তিথিতে গুরুর সচ্চিদানন্দ রূপের প্রকাশ বেশি এই ভাবনা নিয়েই এটা পালন করা হয়।

পরম গুরু বেদব্যাস লোকশিক্ষার জন্য কী কী করেছেন তা জানা উচিত বা দরকার।

(১) সনাতন ধর্মের দার্শনিক ভিত্তি কী? হিন্দুধর্ম কীসের ওপর দাঁড়িয়ে আছে তার সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

(২) চতুরাশ্রম ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করে ভারতীয় সংস্কৃতির মূল ভিতকে দৃঢ় করেছেন।

(৩) অখণ্ড বেদ ছিল সাধারণ মানুষের বোধগম্যের বাইরে। তিনি তা ভাগ (ব্যাস) করে সাধারণ মানুষের কাছে বোধগম্য করেছেন। বেদ বিভাজন করেছেন বলেও তাকে বেদব্যাস বলা হয়।

(৪) শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারত, অষ্টাদশ পুরাণ, ব্রহ্মসূত্র, বৃহৎসংহিতা, তীর্থপরিভাষা, দত্তকদর্পণ, যোগসূত্রভাষ্য, শিবপুরাণের মতো অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। মহাভারতের প্রতিটি পৃষ্ঠা আজও জীবন্ত। মহাভারতকে বলা হয় ভারতীয় সংস্কৃতির 'এনসাইক্লোপিডিয়া'। তাই তা পঞ্চমবেদ নামে অভিহিত।

(৫) বেদ ও উপনিষদের মূল কথাগুলি নিয়ে অতি সহজ ও সরল ভাষায় গল্প ও উপাখ্যানের মাধ্যমে পরাবিদ্যা ও অপরাবিদ্যার দীপ জ্বালিয়ে অষ্টাদশ পুরাণের রচনাকে চিরস্মরণীয় করেছেন।

(৬) তীর্থক্ষেত্র আবিষ্কার ও তীর্থ মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা করে জাতীয় সংহতির বীজ রোপণ করেছেন।

(৭) ছন্দোময় সামবেদের প্রসার ঘটিয়ে উচ্চাঙ্গসংগীত তৈরি করেছেন। মানব মনের উৎকর্ষতা ও অন্তর্মুখীনতা বাড়িয়ে হৃদয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজ করেছেন এই উচ্চাঙ্গ সংগীতের মাধ্যমে। উচ্চাঙ্গ সংগীতের সুরস্রষ্ঠাও তিনি।

(৪) মানুষের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে পূর্ণতা প্রাপ্তির জন্য যা যা দরকার তার বাস্তব মানচিত্র এঁকে দিয়েছেন।

এগুলো জানলে তবেই তো পরম গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা তৈরি হবে। ভারতীয় সংস্কৃতিতে গুরুর মহত্ত্ব চিরকালই আছে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মাতা, পিতা, শিক্ষক, চাকরিক্ষেত্রে প্রশিক্ষক সকলকেই গুরুর মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। কত শ্লোক আমরা মুখস্থ করেছি। তাতে সদ্‌গুরুর কথা বলা হয়েছে। আমরা সঙ্ঘের মধ্যে রাষ্ট্রগুরুর কথাও শুনেছি।

বলা হয়েছে—

গুরু গোবিন্দ দোখ নোঁড়ে, কাকে লাগু পায়

বলিহারি গুরু আপনে, গোবিন্দ দিও বতায়।

(ভগবান ও গুরু দাঁড়িয়ে আছেন, কাকে প্রথমে প্রণাম করো। ধন্যবাদ গুরু আপনাকে, গোবিন্দের পরিচয় তো আপনিই করিয়েছেন।)

কাকে গুরু করব তা চিন্তা ভাবনা করে বানাতে হবে—

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, যে ব্যক্তির আত্মা থেকে অপর আত্মায় শক্তি সঞ্চারিত হয়, যিনি এই মায়ারূপী সংসারের পারে নিয়ে যান, যিনি কৃপা করে (দয়া করে নয়) সব মানসিক অসুখ অর্থাৎ আধি এবং শারীরিক অসুখ অর্থাৎ ব্যাধি দূর করেন, যিনি নাম, যশ, অর্থ বা কোনও স্বার্থসিদ্ধির জন্য শিক্ষা দান করেন না, সমগ্র মানবজাতির প্রতি শুদ্ধ প্রেমেই যিনি কর্ম পরিচালনা করেন, যিনি নিষ্পাপ ও কামগন্ধহীন, যিনি ব্রহ্মচারী তিনিই প্রকৃত গুরু।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলেছেন, তোমার 'প্রবুদ্ধ আত্মাই' তোমার সদ্‌গুরু। তোমার আমার বাইরের গুরুর দরকার নাই।

তবে মনুষ্য বুদ্ধি বা মনুষ্যদৃষ্টি নিয়ে গুরুকে পরীক্ষা করতে হয় না। গুরুকে দেখার জন্য মনকে শুদ্ধ, করে। মনের মলিনতা দূর করে, ঈশ্বরীয় ভাব নিয়ে গুরুর কাছে যেতে হয়। এতে দৃষ্টির পরিপক্কতা বাড়ে। তাইতো বলা হয়েছে— গুরুর রাজসিক ব্যবহার দেখলে তাঁকে 'ব্রহ্মা' জ্ঞানে, শরণাগতদের পালনে ব্যস্ত দেখলে 'বিষ্ণু' জ্ঞানে, ক্রুদ্ধ দেখলে 'রুদ্র' জ্ঞানে, শান্তিতে অবস্থান করতে দেখলে 'গঙ্গা' জ্ঞানে, শাস্ত্রজ্ঞান বিচারে মগ্ন দেখলে 'গণপতি' জ্ঞানে, অন্যের ভ্রম বা মনের অন্ধকার দূর করার কাজে লিপ্ত দেখলে 'দিবাকর' জ্ঞানে তার শরণাগত হবে। তোমার দৃষ্টির পরিপক্কতা বাড়বে, মন শুদ্ধ হবে। এই শুদ্ধ মনই হলো 'প্রবুদ্ধ আত্মা'— তাই সদ্‌গুরু। আর বাহ্যগুরুর দরকার নাই। গুরু নির্দেশিত পথে চলতে পারলেই মন শুদ্ধ হয়। মনের অহংকারকে সমর্পিত করতে হবে। তাই বলা হয়েছে— 'যাঁহাগুরু রাখে পৈতে, চেলা রাখে মাথা।'

শুধু গুরু উপযুক্ত হলেই চলবে না, শিষ্যকেও উপযুক্ত হতে হবে। স্বামীজীর কথায় শিষ্যের প্রথম গুণ হলো পবিত্রতা, প্রকৃত জ্ঞানবিপাসু, অধ্যবসায়, ব্যাকুলতা, ক্ষমা, দয়া, সন্তোষ, সত্য এগুলো অমৃত সমান জেনে তার অনুশীলন করতে হবে। 'প্রণিপাতেন, পরিপ্রশ্নেন সেবয়া-র মাধ্যমে গুরুর কাছ থেকে সব জানতে হবে। তাইতো বলা হয়,

গুরু মিলে লাখ লাখ

চেলা মিলা ভার।

(গুরু লক্ষ লক্ষ পাওয়া যাবে, কিন্তু শিষ্য পাওয়াই কঠিন।)

প্রদীপ, ধূপ, জ্বালিয়ে প্রচুর পরিমাণে ভোগ রেখে আমরা গুরুর কৃপা লাভের জন্য প্রার্থনা করি, কিন্তু এগুলোকে কর্মকাণ্ড বলে। গুরুর কৃপালাভের জন্য প্রয়োজন উপাসনা। প্রাণবান উপাসনা। আত্মপরিষ্কার ও আত্মনির্মল হতে পারলে সাধনা বা উপাসনার শুরু। কিন্তু সেই সাধনাকে হতে হবে প্রাণবান। গীতায় ভগবান বলেছেন, 'সব কিছু আমাতে সমর্পিত করে কর্ম করে যাও। প্রাণবান উপাসনা করে যাও। আমার কৃপা লাভ করবে। আমরা আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দিনের পর দিন কাটাতে পারি, কোনও অসুবিধা হয় না। কিন্তু উপাসনার স্থলে ৫ মিনিটও ভগবানের সান্নিধ্যে থাকতে পারি না। যখন মন বসে না, তখন বুঝতে হবে কিছুর অভাব আছে। যার কাছে সব কিছুর ভাণ্ডার আছে তাঁর কাছে বসতে পারছি না। কারণ একটাই এর মধ্যে আমার প্রাণ নাই। কর্মকাণ্ড পালনের সময় আমার মধ্যে সমর্পণ ভাব তৈরি হয়। শুধু পার্থিব সম্পদ সমর্পণ করলে হয় না, মনকে সমর্পিত করতে হয়।

আমরা ভাবি পরিশ্রম ভগবান করবেন। ফল পাব আমি। এটাই ভগবানের আশীর্বাদ। কিন্তু না পরিশ্রম আমাদেরই করতে হবে, চেষ্টা আমাকেই করতে হবে, পুরুষার্থ পালন আমাকেই করতে হবে তাতে লাভ হবে ঈশ্বর। এই এটাই আশীর্বাদ। পূতপথের জন্য আমাদের পাত্রতার বিকাশ ঘটাতে হবে। যা ঋষি বিশ্বামিত্র করতে পেরে ব্রহ্মর্ষি হয়েছিলেন।

আমরা সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক। শয়ে শয়ে বৌদ্ধিক শুনেছি, বক্তার প্রশংসা করেছি, কিন্তু তা নিজের অনুভবে আনতে পারছি না, বিপত্তি এখানেই। আমাদের গুরু গৈরিকপতাকা। যাকে প্রাতস্মরণীয় ডাক্তারজীর Long Range Vision এবং Total thought-এর ফসল বলতে পারি। তন, মন, ধন দিয়ে, শেষে নিজের জীবন দিয়ে আরাধনার কথা বলা হয়েছে, আমরা জানি সঙ্ঘের কার্যক্রম আর সঙ্ঘের আদর্শের মধ্যে কোনও তফাত নেই। সঠিকভাবে কার্যক্রম পালন করতে পারলে বোঝা যাবে সঙ্ঘের আদর্শ আমি গ্রহণ করতে পারছি। সেজন্য বলা হয় আমরা কেউই এখনও পরিপূর্ণভাবে স্বয়ংসেবক হয়ে উঠতে পারিনি। বয়ম্ হিন্দুরাষ্ট্রাঙ্গভূত এই মনোভাব এলে তবেই প্রকৃত স্বয়ংসেবক। আমরা একটা পদ্ধতির মধ্যে যুক্ত আছি। গুরুপূর্ণিমায় গুরুর পূজা আমাদের তখনই সার্থক হবে যখন এই পদ্ধতির সঙ্গে প্রাণ দিয়ে যুক্ত থেকে নিজের পাত্রতার বিকাশ ঘটাতে পারব। □

লোকমাতা রানি রাসমণির অর্পণনামা এবং ১৫০ বছরের মামলা

সুবল সরদার

আমি এখন ইতিহাসের পাতা ওলটাচ্ছি। কবর থেকে উঠে আসা জ্যান্ত ভূতের মামলা দেখছি। ফিরে যাই ১৮৭৩ সালের সেই গা-ছম ছম করা এক ঐতিহাসিক মামলায়। বংশ, অংশ, দ্বন্দ্ব— এমন এক ঐতিহাসিক মামলা নিয়ে আজকের এই প্রসঙ্গ। তখন ভারতবর্ষে কলকাতা হাইকোর্ট বিল্ডিং তৈরির কাজ সবে শেষ হয়েছে। সাল ১৮৭২, ১ জুলাই। আর এই মামলা শুরু হয় ঠিক ওই সালে অর্থাৎ ১৮৭২, ২১ জুন। সেই শুরু থেকে ইতিহাসের পথ ধরে আজও হুগলী নদীর মতো বয়ে চলেছে সেই মামলা। এই মামলার নথিতে জড়িয়ে আছে লোকমাতা রানি রাসমণি এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দির।

লোকমাতা রানি রাসমণি অর্পণনামা করেছিলেন তাঁর আট নাতির নামে। জমিদারি ভাগের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দিরের সেবাইতও হয় ওই আট জনই। তারা হচ্ছেন পদ্মমণি দাসী ও স্বামী রামচন্দ্র দাসের তিন ছেলে— গণেশ দাস, বলরাম দাস, সীতানাথ দাস। মৃত কুমারী চৌধুরী ও স্বামী প্যায়ারী মোহন চৌধুরীর এক ছেলে যদুনাথ চৌধুরী। করুণাময়ী বিশ্বাস ও স্বামী মথুরমোহন বিশ্বাসের এক ছেলে ভূপাল চন্দ্র বিশ্বাস। জগদম্বা বিশ্বাস স্বামী মথুরামোহন বিশ্বাসের তিন ছেলে, দ্বারিকনাথ বিশ্বাস, ত্রৈলক্যনাথ বিশ্বাস, ঠাকুরদাস বিশ্বাস। চার মেয়ের আট নাতি। করুণাময়ী অকালে মারা গেলে রানিমার ছোটো মেয়ে জগদম্বাকে মথুরমোহন আবার বিয়ে করেন রানিমার আদেশে।

এই অর্পণনামা লেখা হয়েছিল রানিমার বয়ান অনুসারে ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৮৬১ সালে। রেজিস্ট্রি হয় আলিপুর ডিস্ট্রিক্ট

রেজিস্ট্রি অফিসে ২৭ আগস্ট ১৮৬১ সালে। এই অর্পণনামা লিখেছিলেন মোক্তার প্রসন্ন চন্দ্র বোস। এই অর্পণনামায় রানিমার সই আছে ঠিক এভাবে 'শ্রীরাসমণি দাসী'।

এই অর্পণনামার ইসাদি অর্থাৎ সাক্ষী ছিলেন ছ'জন। ১ কণ্ঠ দত্ত, ২ হরি ঘোষ, ৩ অন্তশা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ৪ প্রসন্ন চক্রবর্তী, ৫ দুর্গা প্রসাদ মান্না, ৬ রামচন্দ্র বসু পুরোহিত। এই অর্পণনামা অনুসারে তিনি নিজেই ছিলেন দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দিরের প্রথম সেবাইত। অপর্ণনামা রেজিস্ট্রি হয় তাঁর মৃত্যুর ঠিক ছ' মাস পরে অর্থাৎ ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৬১ সালে। অর্পণনামায় যা লেখা আছে তা হুবহু ভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

৩১ মে, ১৮৫৫ সালে স্নানযাত্রা উপলক্ষ্যে দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দিরে প্রথম পূজা হয়। প্রথম পুরোহিত ছিলেন রামকুমার চট্টোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণদেবের দাদা। পরে গদাধর অর্থাৎ রামকৃষ্ণদেব এসেছিলেন। তাঁকে সাহায্য করতেন তাঁর ভাগ্নে হৃদয়রাম।

এবার আসি মামলা প্রসঙ্গে। ধর্মের দেশে ধর্ম ভাবনা প্রবল হয় এটা সবাই জানে। যত বেশি তীর্থযাত্রী, তত বেশি আয় হয়, আর যত বেশি আয় হয়, তত বেশি দ্বন্দ্ব বাধে ওই আট সেবাইতের মধ্যে। এই হচ্ছে মোকদ্দমার কারণ। কেস নম্বর সি এস ৩০৮/১৮৭২- পদ্মমণি দাসী এবং অন্যান্য, বনাম জগদম্বা দাসী এবং অন্যান্য।

জানবাজার জমিদার বাড়ি, দক্ষিণেশ্বর কালিমন্দির রেঁনেসাসের পীঠস্থানেও মামলার বোঝা। স্বর্গেও ছুঁচোর কেত্তন। জমিদারির কৌলিন্য (জেলে সম্প্রদায়), ব্রাহ্মণের ছোঁয়া, কায়স্থের ভালোবাসা এক মিলন মেলার পুণ্যভূমি হয়ে ওঠে। স্বামী বিবেকানন্দের স্পর্শে আন্তর্জাতিক বহিঃপ্রকাশের আবেগ বিস্ময় জাগায়। এমন জায়গায় থেকেও যেতে হয় উচ্চ ন্যায়ালয়ে বিচার পেতে। এটাকে অনেকে স্বর্গ থেকে নরকযাত্রা বলে থাকেন।

এই ধর্ম মামলার পিছনে আছে যত অধর্মের লোভী কাহিনি। লোভ,হিংসা, প্রতিহিংসার চরিতার্থের জটিল কাহিনি। রানিমার স্বপ্নের সমাধি বলা যায়। এ মামলার সাক্ষী শুধু সাধারণ মানুষ নয়, ভক্তবৃন্দ থেকে শুরু করে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব, স্বামী বিবেকানন্দও। তবুও ঠাকুর ঘরের দ্বন্দ্ব ঠাকুর

ফঃ ৫

ঘরে মিটল না। দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির থেকে বের হয়ে সোজা কলিকাতা হাইকোর্টের মহাধর্মাধিকরণের কাঠগড়ায় এখনও দাঁড়িয়ে আছে— বাঙ্গালির হাইকোর্ট দেখানো যাকে বলে! তৎকালীন ইংরেজ বিচারক ম্যাকফারসনের সরস মন্তব্য খুব তাৎপর্যপূর্ণ ঃ

He (the collector of parganas) preferred the plaintiffs (padmamoni and othrs) to the civil court to establish the right which they asserted.

কালেক্টরের এই রায়ের বিরুদ্ধে পদ্মমণিদেবী প্রেসিডেন্সি ডিভিশনের কমিশনের কাছে আবেদন করেন। কমিশনার সাহেব কালেক্টরের আদেশকে বাতিল করে পদ্মমণি-সহ বাদীদের নাম সেবায়েত রূপে রেকর্ড করার আদেশ পাঠান সংশ্লিষ্ট অফিসারের কাছে। তারিখ ২১ মার্চ ১৮৭২ সাল। কিন্তু কমিশনারের এই আদেশকে জগদম্বা ও অন্যান্য বাদি পুনর্বিবেচনার জন্যে আবেদন জানালে কমিশনার সাহেব বিষয়টিকে ২৪ পরগনার কালেক্টরের কাছে ফেরত পাঠান আরও সাক্ষ্য প্রমাণের জন্যে। তারিখ ৪ এপ্রিল, ১৮৭২ সাল।

১৮৫০ সালে নির্মীয়মান দক্ষিণেশ্বর মন্দির।

কারণ জগদম্বার দাবি ছিল পদ্মমণিকে সুযোগ দেওয়া সত্ত্বেও তারা তাদের কর্তব্যে গাফিলতি করে সময় নষ্ট করেছেন এবং সেবাইত হিসেবে কাজ করতে অস্বীকার করেছেন। কমিশনের ওই আদেশের বিরুদ্ধে ১৮৭২ সালের ৪ মে তারিখে পদ্মমণি 'কলিকাতা বোর্ড অব রেভেন্যু'র কাছে আবেদন করেন। প্রার্থনা করেন যে কমিশনারের ১৮৭২-এর ২১ মার্চ তারিখের আদেশকে পুনরায় বলবৎ করা হোক। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এবারেও তাদের আবেদন ১৮৭২-এর মে মাসেই নাকচ হয়ে যায়। তখন বাধ্য হয়েই পদ্মমণি ও অন্যান্যরা আইনের পথে উচ্চ ন্যায়ালয়ের দরজায় দাঁড়াতে বাধ্য হন। তার আগে পদ্মমণি তার অ্যাটর্নি মারফত ট্রাস্ট পরিচালনে তাদের সবার অংশীদারিত্ব প্রদানের দাবি জানিয়ে জগদম্বাকে পত্র দেন। তারপর ১৮৭২ সালে ২০ জুন জগদম্বার বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন বিচারক ম্যাকফারসনের আদালতে। সেই সঙ্গে প্রয়োজনে রিসিভার বসানোর আবেদনও করেন। এটিই সেই বিখ্যাত

Suit No 308/1872

Puddomoney Dossee and ors. vs. Jogodumba Dossee and ors.

In the High Court Judicatue at Fort William in Bengal Ordinary orginal civil Judication

১৮৭৪ সালের ২১ ডিসেম্বরের রায়ে মি: ম্যাকফারসন দুই বোনের (পদ্মমণি ও জগদম্বার) মধ্যে তৎকালে বিরাজিত তিক্ত বা সাপে নেউলে সম্পর্কের কথা যে ভাষায় (সম্ভবত বিরক্ত হয়ে বা মজা করে) ব্যক্ত করেছেন তা ঐতিহাসিক নথি হিসেবে হুবহু নীচে তুলে ধরা হলো ভবিষ্যতে লোকমাতা রানি রাসমণি দেবীর দূরদর্শিতার অভ্রান্ততা অনুধাবন করার জন্যে : These two persons are constantly and ceaselessly engaged in litigation of every description with each other and it is impossible for me to exclude from my—'

এই প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখি প্রথমে বাদী বিবাদী ছিলেন পদ্মমণি বনাম জগদম্বা। ওই দুজনের অবর্তমানে আগে বলরাম দাস বনাম গুরুচরণ বিশ্বাস। রানিমার ইচ্ছাকে সম্মান জানালে ওই অর্পণনামা অনুসারে রানিমার সকল তস্য নাতিরা সকলে সমান অংশীদারিত্ব পান। এতো দীর্ঘদিন ধরে আইনের জটিল পথে হেঁটে হাইকোর্টের কড়িকাঠে প্রাণপাত করতে হয় না। রানিমার কৃপা, মা কালীর আশীর্বাদ তস্য নাতিদের উপর সমানভাবে বর্ষিত হলে এই কাহিনির উদ্ভবও হয় না। মাকালীর আশীর্বাদ সমানভাবে বর্ষিত হয়নি বলে এই কাহিনির উদ্ভব। কাগজের আদেশ কাগুজে মনে হয়। বাস্তবতা কোথায়? এতদিনে হুগলী নদী দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। বাদী, বিবাদী এক হয়ে গেলেও মামলা নতুন জটিল রূপ ধারণ করে। বর্তমানে এই মামলার বাদী, বিবাদীরা এক হয়ে গেছে তবুও মামলা নিষ্পত্তি হয়নি। মৃত বলরাম দাস বনাম মৃত গুরুচরণ বিশ্বাস হাইকোর্টের চোখে এখনো জীবিত। এমন অন্ধ আইনের সাহায্যে মৃত বাদী-বিবাদীকে স্যালাইন দিয়ে বাঁচিয়ে রাখার মরিয়া প্রচেষ্টা হচ্ছে এই মামলায়। বাস্তবে ১৯২৯ সালে হাইকোর্টের আদেশের কোনো নির্দিশিকা মেনে চলা হয় না। এখন আইনি লড়াই যেমন জারি আছে থাকছে। হয়তো আগামী কোনোদিন জানা যাবে এর শেষ কোথায় এবং কারা কারা থাকবেন রানিমার সেবাইত।

□

হরিয়ানার মেওয়াত জেলার বহু গ্রাম হিন্দুশূন্য

সুদীপ নারায়ণ ঘোষ

হরিয়ানায় একটা মাত্র বিশেষ সম্প্রদায় অধ্যুষিত জেলা রয়েছে। নাম মেওয়াত। সেখানে হিন্দুদের ওপর বিভিন্ন অত্যাচারের ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয় পুলিশও কাজ করতে ভয় পায় বলে অভিযোগ উঠেছে। এ বিষয়ে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সিনিয়র বিচারক তদন্ত করেছেন। জিজ্ঞাসাবাদের পর তাঁর উন্মোচিত কিছু তথ্য এরূপ :

ফিরোজপুর গ্রামে চাকরির অজুহাতে এক মহিলাকে অপহরণ করা হয়েছে। কয়েকদিন ধরে ইউসুফ নামে একজন যুবক-সহ নয়জন তাকে গণধর্ষণ করে। অপরাধীদের বিরুদ্ধে আইপিসি ধারা ৩৭৬ (ধর্ষণ)-এর অধীনে একটা এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়েছিল, কিন্তু পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। অভিযোগ, মহিলাকে হাসপাতালে ভর্তি করার পর তাকে হত্যা করা হয়। আইপিসি ধারা ৩০২ (খুন)-এর অধীনে দায়ের করা এই এফআইআরেও পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নেয়নি এবং পরিবর্তে এটাকে আত্মহত্যা বলে চালানো হয়েছে।

মেওয়ালি গ্রামের এক দলিত মেয়েকে ২০২০ সালে ৮ ফেব্রুয়ারি, সাজিদ নামে একটি যুবক অপহরণ করেছিল; আজ পর্যন্ত মেয়েটির সন্ধান মেলেনি।

ইসারের ছেলে নিজাম তার সহযোগীদের নিয়ে বন্দুকের নল ঠেকিয়ে এক দলিত মেয়েকে অপহরণ করে। একটা এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়েছিল কিন্তু মেয়েটিকে বিবৃতি দিতে বাধ্য করা হয়েছিল যে সে পালিয়ে গেছে এবং নিজের ইচ্ছায় বিয়ে করে ইসলাম গ্রহণ করেছে।

মেওয়াত গ্রামে দলিত মেয়েদের নিয়মিতভাবে রাস্তায় শ্লীলতাহানি করা হয়। তাদের উপস্থিতিতে অশ্লীল কাজ করা হয় এবং তাদের অপহরণ করার চেষ্টা করা হয়। এই কারণে দলিত মেয়েরা স্কুলে যায় না বা গেলেও মাঝপথেই পড়াশোনা ছেড়ে দেয়। শেখপুর গ্রামের এক দলিত মেয়ে গত কয়েক মাস ধরে নিখোঁজ রয়েছে।

সিরোলি গ্রামের একজন বাল্মীকি সমাজের মহিলার বিয়ের সময়ে ১৫ জন মিলে কনেকে অপহরণের চেষ্টা করলে গ্রামের যুবকরা তাদের বাধা দিতে মারধর করে।

মেওয়াতে দলিত মেয়েদের বিয়ে উপলক্ষ্যে বিয়ের মণ্ডপ ভাঙা ও লুটপাট একটি সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ঘাসেরা গ্রামের জনৈক জুনায়েদ দুই সন্তানের মাকে অপহরণ করে জোরপূর্বক বিয়ে করে। সে এখন তার দুই নাবালিকা মেয়েকে ইসলাম গ্রহণের জন্য চাপ দিচ্ছে। এমনকী সে ফোনে মেয়েদের অশ্লীল মেসেজ দেখতে বাধ্য করে।

নুহ গ্রামের এক দলিত নাবালিকা মেয়েকে অপহরণ ও গণধর্ষণ করেছে চারজন বিশেষ সম্প্রদায়ের যুবক। অভিযোগ এক সংখ্যালঘু পুলিশের বাড়িতে এই জঘন্য অপরাধ সংঘটিত হয়।

৭ জুলাই, ২০১৯-এ নথিভুক্ত এফআইআর-এর কোনও পদক্ষেপ নেই।

বিচারক তারপরে দলিত পুরুষদের উপর ঘটিত নৃশংসতার ছ'টি মামলা তালিকাভুক্ত করেছেন। গ্রামের বিছোড়ের বাসিন্দা রামজীলালকে ইকবাল নামে একজন নির্মমভাবে মারধর করে। রামজীলাল ওই গ্রামের মহিলা সরপঞ্চের বাবা। ইকবাল তার সহযোগীদের নিয়ে রামজীলালের পেট কেটে ফেলে এবং তুলো জড়িয়ে জীবন্ত পুড়িয়ে দেয়। এফআইআর নথিভুক্ত হওয়ার পরেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। পুলিশ এটাকে বজ্রপাতে মৃত্যু বলে ঘোষণা করেছে।

২০ এপ্রিল, ২০২০-তে হানিফ নামে একজন তার কয়েক জন সহযোগীর সঙ্গে চুন্দিকা গ্রামে এক দলিত যুবককে তার বড়ি থেকে অপহরণ করে। তারা যুবককে রড ও লাঠি দিয়ে মারধর করে এবং মারা গেছে মনে করে চলে যায়। এফআইআর নথিভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। পরিবর্তে, অভিযোগকারীর উপর চাপ তৈরি করা হচ্ছে এফআইআর প্রত্যাহার করার জন্য। না করলে তাদের মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হবে। সেই দলিত ছেলেটির একমাত্র দোষ ছিল যে সে ধারের টাকা ফেরত চেয়েছিল।

কিরঞ্জ গ্রামে দলিতদের জন্য বরাদ্দকৃত প্লটগুলো কামরুদ্দিন তার সহযোগীদের সঙ্গে দখল করেছিল এবং আজ পর্যন্ত ভুক্তভোগীদের অভিযোগের ভিত্তিতে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

২০২০-র ২১ এপ্রিল, আতিস তার দশ-পনেরো জন সঙ্গী নিয়ে পুলেতা গ্রামের বাসিন্দা রাহুলের পথ আটকে দেয়। তারা তাকে জাতপাতের অপবাদ দেয় এবং তার পরিবারকে লাঞ্ছিত করে। পুলিশ তদন্ত ছাড়াই এসসি/এসটি আইনের বিধান উপেক্ষা করেছে, কোনও ব্যবস্থা নেয়নি।

২০২০-র ৭ এপ্রিল আসিফ নামে একজন নাগিনা গ্রামের বাসিন্দা যোগেশকে লাঠি দিয়ে মারধর করে, আর সাকির বন্দুকের নল ঠেকিয়ে তার ড্রয়ার থেকে ২২,০০০ টাকা নিয়ে যায়। এফআইআর হলেও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

বিসরু গ্রামে ইউনুস তার দোকানে রেশন বিতরণ করছিল, সেখানে ২৫-৩০ জন লোক ভিড় করে দাঁড়িয়ে ছিল। বিনোদ নামের এক দলিত ছেলে প্রহরী হিসেবে কাজ করে। সে তাদের কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ রোধ করতে সামজিক দূরত্ব বজায় রাখতে বলেছিল। কিন্তু তখন আরিফ তাকে ধর্মের নামে গালিগালাজ করে। পুলিশ এখনো কোনো ব্যবস্থা নেয়নি।

বিচারক আরও বলেন যে মেওয়াতের প্রায় ৫০০টি গ্রামের মধ্যে ১০৩টি সম্পূর্ণরূপে হিন্দুবিহীন হয়ে পড়েছে এবং ৮২টি গ্রামে মাত্র চার-পাঁচটি হিন্দু পরিবার অবশিষ্ট রয়েছে। কুমার বলেছিলেন যে এই পরিসংখ্যানগুলি গ্রামবাসীদের বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে।

উপরের মামলাগুলো হাইলাইট করেছেন বিচারপতি নিজেই। এই সমস্ত ক্ষেত্রে যেটি সাধারণ তা হলো যে পুলিশ কোনো ব্যবস্থা নেয়নি (অধিকাংশ হিন্দু হওয়া সত্ত্বেও)। কেন? কারণ কোনো পুলিশ ব্যবস্থা নিলে তাকেও হত্যা করা হয়, তার পরিবারের ওপর হামলা হয়। মেওয়াতের এমন কিছু এলাকা আছে যেখানে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার ভয়ে পুলিশ যেতে সাহস করে না।

এই হলো হরিয়ানার অবস্থা বিজেপি ক্ষমতায় থাকা সত্ত্বেও। কংগ্রেস ক্ষমতায় থাকাকালীন কী ঘটত তা কল্পনা করুন।

উৎস : সরকারি তথ্য ও স্থানীয় জনগণের কাছ থেকে পাওয়া বিবরণ। □

মহামারী কাটিয়ে সুর ঝংকার স্বমহিমায় ফিরছে

বাবুলকৃষ্ণ দে

সাংস্কৃতিক জগতে সংগীত ও নৃত্য শিল্পী মায়া দে এখন একটি প্রথিতযশা নাম। তার তৈরি 'সুর ঝংকার' নৃত্য ও সংগীতের স্কুল দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। বাটানগর মফসস্‌ল শহরের এক কোণে যার সূত্রপাত ঘটেছিল প্রায় ২০ বছর আগে। আজ মফসস্‌ল ও কলকাতার বিভিন্ন স্থানে এর শাখা প্রসারিত হয়েছে। বর্তমানে প্রায় সাড়ে চারশোর মতো ছাত্র-ছাত্রী সুর ঝংকার নৃত্যগীতের চর্চা করে চলেছে নামমাত্র পারিশ্রমিকের বিনিময়ে। কলকাতার বিভিন্ন মঞ্চে এদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রতি বছর অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে। তপন থিয়েটার, ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট, জ্ঞানমঞ্চ, মধুসূদন মঞ্চ, নিরঞ্জনসদন, অবনমহল, সুজাতা সদন, নেতাজী ইনস্টিটিউট ও অন্যান্য প্রেক্ষাগৃহে এদের অনুষ্ঠান হয়েছে।

মায়া দে অত্যন্ত গুণী শিল্পী। বাংলাভাষায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ পাশ করে চণ্ডীগড় ঘরানা থেকে রবীন্দ্রসংগীত ও নজরুলগীতিতে পঞ্চম বর্ষ বিশারদ ডিগ্রি লাভ করেছেন।

নৃত্যে ভরতনাট্যম্ ও কত্থক নৃত্যে পঞ্চম বর্ষ বিশারদ ডিগ্রি অর্জন করেন চণ্ডীগড় ও প্রয়াগ থেকে। যে সমস্ত স্কুলে তিনি শিক্ষকতা করছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো শিয়ালদহে 'টেকনিক স্কুল অব মিউজিক', 'বালীগঞ্জ গীতবিথিকা', গোলপার্ক, টালিগঞ্জ 'সুরছন্দম', বারুইপুরে 'আনন্দম', বাটানগরে 'সুর ঝংকার', কসবা ধর্মতলার 'নূপুর'। এছাড়া বিভিন্ন নৃত্য ও সংগীত প্রতিযোগিতায় বিচারকের আসন অলংকৃত করে আসছেন বহু বছর ধরে। আমি তার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে প্রত্যক্ষ করেছি তার সৃজনশীল প্রতিভাকে।

মায়াদেবীর নৃত্যগীত শিক্ষার স্কুল সুর ঝংকার এত বছর ধরে সুনামের সঙ্গে কাজ করে যাওয়ার জন্য সর্বস্তরে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

কোনোরকম হতাশা যেমন তাঁকে গ্রাস করতে পারেনি, তেমনি কোনো বাধা বিপত্তি তাকে থামিয়ে দিতে পারেনি। উৎসাহ ও উদ্দীপনায় ভরপুর এমন মানুষ সবারই নজর কাড়ে। সেই জন্যই বোধকরি তার জনপ্রিয়তা এতোটুকু ম্লান হয়নি। বাটানগরের প্রান্তে বাটামোড়ে তাঁর স্কুল খুব ভালো ভাবেই চলছে। ছাত্র-ছাত্রীরা আবার পুরোদমে আসা যাওয়া করছে, স্কুলবাড়ি গমগম করছে। এটা দেখতে কার না ভালো লাগে। অতিমারি বেশ কিছুটা স্তিমিত হতেই কলকাতা-বারুইপুর-সোনারপুর অঞ্চলের স্কুলগুলি পুরোদমে খুলে গিয়েছে। কলকাতা ও মফস্‌সলের স্কুলগুলিও আবার সরগরম হয়েছে ছাত্র-ছাত্রীদের কলকাকলিতে।

বর্তমানে মায়া দে আবার তাঁর কর্মযজ্ঞে ঢুকে পড়েছেন এবং আগের মতো ব্যস্ত হয়ে গিয়েছেন। ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি তাঁর নজর, প্রেম-ভালোবাসা তাঁকে আবার কর্মযজ্ঞে পূর্ণোদ্যমে শামিল করতে পেরেছে। তাঁর কাছে প্রশিক্ষণ নিয়ে যেসব ছাত্র-ছাত্রী বিভিন্ন জায়গায় বর্তমানে শিক্ষকতা করছেন তারাও তাদের গুরুকে ভোলেনি। তাই মাঝে মাঝেই তারা এসে সুরঝংকারে ভিড় করেন। শুধু তাই নয়, তাদের প্রিয় দিদির কচিকাঁচাদের তারাই শেখানোর দায়িত্ব নিয়েছেন।

অতিমারিতে তাকে অকাতরে গম, আটা, চাল ও অন্যান্য সামগ্রী দুঃস্থদের বিলি করতেও দেখা গেছে। জিজ্ঞাসা করে জানতে পেরেছি সমাজ সেবায় মনে কী গভীর আনন্দ ও পরিতৃপ্তি পাওয়া যায় তা অন্য কিছুতে সম্ভব নয়। মায়া দে'র একটা বড়ো কাজ প্রতি বছর কলকাতার বড়ো বড়ো প্রেক্ষাগৃহে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে বড়ো উৎসব করা। অচিরেই আমরা দেখতে পাবো সুরঝংকারের ধিনতা ধিন-এর দামামা, নূপুর ছন্দের রণন, ঘুঙুরের আওয়াজ। □

চালকের আসনে বসে তারুণ্যের স্বপ্ন ছোটাচ্ছেন কল্পনা

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। রোগা ছিপছিপে গড়নের মেয়েটাকে চালকের আসনে দেখে অনেকেই সেদিন তাজ্জব বনে গিয়েছিলেন। পাকা হাতে স্টিয়ারিং ধরে এক তরুণী কলকাতার রাজপথে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে আস্ত একটা বাস। সে দৃশ্য দেখে বাহবা দিয়েছিলেন ট্রাফিক সার্জেন্টরাও। তিলোত্তমা কলকাতার বাসযাত্রীদের কাছেও সেদিনটা ছিল একটু অন্যরকম। সেদিন তাঁদের স্থলপথের কাণ্ডারি ছিলেন সদ্য কুড়ি পেরনো অসীম সাহসী এক মেয়ে। নাম কল্পনা মণ্ডল।

নোয়াপাড়া থেকে এসপ্ল্যানেড রোজ এই রুটেই ৩৪সি বাস নিয়ে ছুটে বেড়ায় কল্পনা। গন্তব্য পথে স্থির দুটো চোখ। তাঁর কোমল হাতে বশ মেনেছে বাসের স্টিয়ারিং ও শক্ত গিয়ার। এ মেয়ের বাস চালানো দেখে অবাক হন দীর্ঘদিনের ডেলি প্যাসেঞ্জাররাও।

বরাহনগরের কিছুদূরে নোয়াপাড়া মেট্রো স্টেশনের কাছেই বাড়ি কল্পনা মণ্ডলের। বাবা সুভাষ মণ্ডল ছিলেন ৩৪সি বাসেরই চালক। সেই ছোটবেলায় কল্পনাকে পাশে বসিয়ে গাড়ি চালাতেন তিনি। মাঝে মাঝে আবদার করলে কোলে বসিয়ে কল্পনাকে স্টিয়ারিং ধরতে বলতেন বাবা। সেই থেকেই মেয়ের গাড়ি চালানোর শখ। এখন তো শুধু বাস নয়, বাইক থেকে শুরু করে তিন চাকার টেম্পো, চার চাকার যেকোনও গাড়ি চালাতে সিদ্ধহস্ত কল্পনা। ছোটবেলার আগ্রহ আর সাহসের জোরেই এগিয়ে চলেছেন তিনি। অবশ্য মেয়ে যে বাস চালানোকেই কেরিয়ার হিসেবে নেবে এমনটা ভাবেননি মা মঙ্গলা দেবী। বলেন, ‘‘মেয়ে বাস চালাবে তেমন ভাবনাচিন্তা ছিল না। একটা দুর্ঘটনায় ওর বাবা পায়ে চোট পায়। তারপর থেকে আর বাস চালানো সম্ভব হয়নি। চিকিৎসা করাতে অনেক টাকার দরকার। বাবার চিকিৎসার টাকা জোগাড় করতেই গাড়ি চালানোর শখকে রুজি রোজগারের পথ করে নিয়েছে কল্পনা । তবে ও ছোটো থেকেই ভীষণ ডাকাবুকো।’’

ডাকাবুকোই বটে! মাঝে মাঝে টেম্পো গাড়িতে মাল নিয়ে দূরদূরান্তে পাড়ি দেন। হেল্পার হিসেবে বাবা থাকলেও একা একাই মাল তোলেন, মাল নামান তিনি। মাঝপথে টায়ার পাংচার হলে নিজেই চাকা খুলে পাংচার সারিয়ে নেন। বলেন, ‘সবই তো বাবাকে দেখে শেখা। অসুবিধে হলে বাবা দেখিয়ে দেন।’ কল্পনাকে নিয়ে গর্বিত তাঁর বাবা বলেন, ‘ছেলে নেই বলে আমার কোনও দুঃখ নেই। অনেকে অনেক কথা বলে, কিন্তু আমি আমার মেয়েকে নিয়ে গর্বিত। ও ছেলের থেকে কোনও অংশে কম না। আমি চাই আমার মেয়ে একদিন পুলিশের গাড়ি চালাবে।’

কল্পনাকে গাড়ি চালাতে দেখে বহু বাসযাত্রী দু’হাত তুলে আশীর্বাদ করেন। অনেকে সাহস জোগান। বাহবা দেন। কেউ কেউ আবার সমালোচনা বা কটূক্তি করতেও ছাড়ে না। অবশ্য সেসব সমালোচনা গায়ে মাখেন না কল্পনা। বলেন, ‘‘এমনিতে আমাদের বাস স্ট্যান্ডের লোকেরা খুবই ভালো। তাঁরা অভয় দেন। তবু সবাই তো সমান হয় না। কিন্তু আমার বাবা আমায় শিখিয়েছেন, কে কী বলল তাতে কান দিবি না। নিজের লক্ষ্যে এগিয়ে যা। না খেয়ে থাকলে কেউ খাইয়ে দিয়ে যাবে না।’’ বাবা, মা ও এক দিদিকে নিয়ে সংসার কল্পনাদের। পরিবারের সবথেকে ছোট হওয়া সত্ত্বেও সংসারের দায়িত্ব হাসিমুখে কাঁধে তুলে নিয়েছে সে।

সারাদিনে একাধিকবার ধর্মতলা-নোয়াপাড়া সফর সেরে রাতে তাঁর বাড়ি ফেরা। জীবনের এই ওয়ানওয়ে লেনে প্রথম থেকে বাবা তাঁর পাশে থাকলেও বাস পেতে প্রবল সমস্যা ভোগ করতে হয়েছিল কল্পনাকে। ফিরিয়ে দিয়েছিলেন বহু বাস মালিকই। অবশেষে মেলে বাস। এখন তো এক ডাকে সবাই চেনে বরাহনগরের কল্পনাকে। প্রতিদিন নিজের দক্ষতা প্রমাণ করছে সে। আজ পরিজন থেকে প্রতিবেশী সবাই কল্পনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে কোটি কোটি তরুণীর অনুপ্রেরণা হয়ে উঠেছেন কল্পনা মণ্ডল। ফেসবুকে একটি ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছিল, বালি ব্রিজ ধরে ফাঁকা রাস্তায় দ্রুত গতিতে বাস চালাচ্ছে একটি মেয়ে। নাম জানা নেই। কিন্তু একটি মেয়ের এমন বেনজির কৃতিত্ব মুহূর্তে ভাইরাল হয় সোশ্যাল মিডিয়ায়। তার পরেই প্রকাশ হয় তাঁর পরিচয়। তথ্য বলছে, সাম্প্রতিককালের সবচেয়ে কনিষ্ঠ মহিলা বাসচালক হলেন কল্পনা। তাঁর আয়ে এখনও হয়তো স্বচ্ছলতা ফেরেনি পরিবারের। ছুটির দিনেও টেম্পো নিয়ে বেরোতে হয় দূরদূরান্তে। বাবার স্বপ্ন, মেয়ে পুলিশের গাড়ি চালাক। কল্পনা চান ট্রেন চালাতে। ছোটো ছোটো স্বপ্ন জিইয়ে রেখে দিন গুজরান করছে বরাহনগরের মণ্ডল পরিবার। সেইসব স্বপ্ন পূরণের আশায় রাজপথে স্টিয়ারিং হাতে ছুটছে কল্পনা। ◻

লোভী কাক

বোধিসত্ত্ব একবার পায়রা হয়ে জন্মালেন। ব্রহ্মদত্ত তখন বারাণসীর রাজা। সেসময় বারাণসীর লোকেরা পুণ্যের কথা ভেবে পাখিদের জন্য স্থানে স্থানে ঝুড়ি টাঙিয়ে রাখত। বারাণসীর প্রধান বণিকের পাচকও সেজন্য রান্নাঘরে একটা ঝুড়ি রেখে দিয়েছিল। বোধিসত্ত্ব থাকতেন সেই ঝুড়ির মধ্যে।

সকাল হতেই বোধিসত্ত্ব খাবারের সন্ধানে বাইতে চলে যেতেন। সারাদিন এদিক-ওদিক

থেকে খাবার খেয়ে সন্ধ্যায় রান্নাঘরের সেই ঝুড়িতে এসে বিশ্রাম নিতেন। একটা কাক একদিন ওই রান্নাঘরের ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় মাছ-মাংসের গন্ধে পেয়ে যেন পাগল হয়ে গেল। মাছ-মাংস খাওয়ার জন্য তার মন চঞ্চল হয়ে উঠল। কেমন করে রান্নাঘরে ঢুকে মাছ-মাংস খাওয়া যায় সেই চিন্তাই করতে লাগল।

সন্ধ্যার সময় বোধিসত্ত্বকে রান্নাঘরে ঢুকতে দেখে কাক ভাবে, একে ধরেই রান্নাঘরে ঢুকতে হবে। তবেই মন ভরে মাছ-মাংস খাওয়া যাবে। এইসব ভেবে সেদিন ভোর হওয়ার আগেই রান্নাঘরের সামনে এসে হাজির হয় কাক। বোধিসত্ত্ব খাবারের সন্ধ্যানে বের হলে পিছু নেয় । কাককে পিছু পিছু আসতে দেখে পায়রা বলে, কী ব্যাপার ভাই, আমার পেছনে কেন? কাক বলে, তোমাকে আমার খুব ভালো লেগেছে। আমি তোমার চেলা হয়ে থাকতে চাই। পায়রা বলে, তুমি আর আমি সম্পূর্ণ আলাদা। আমাদের খাবারও আলাদা। স্বভাব-চরিত্র কোনোটাতেই আমাদের মিল নেই। তাই আমার অনুচর হয়ে তোমার কোনো লাভ নেই তুমি অন্য কোথাও যাও।

কাক কিন্তু নাছোড়বান্দা। বলে, সব আলাদা হলেও তো আমরা একসঙ্গে থাকতে পারি। আমি রাতে তোমার কাছেই থাকব। পায়রা আর কী করে! রাজি হয় কাকের কথায়। তারপর বলে, একান্তই যদি তুমি আমার সঙ্গে থাকতে চাও, তাহলে খুব সাবধানে তোমাকে থাকতে হবে। লোভ করতে যেয়ো না কিন্তু, তাহলে বিপদে পড়বে। কাক একথায় রাজি হয়ে যায়।

সন্ধ্যায় পায়রার সঙ্গে কাককে আসতে দেখে রাঁধুনি মনে মনে বলে, এ আবার একটা সঙ্গী জুটিয়ে এনেছে দেখছি। তা এনেছে যখন, তাহলে এর জন্যও থাকার একটা ব্যবস্থা করে দিই। কাকের জন্যও সে একটা ঝুড়ি টাঙিয়ে দেয়। পায়রা আর কাক সেই রান্নাঘরে বেশ সুখে থাকতে লাগল।

দিনকয়েক পর বণিক অনেক মাছ-মাংস নিয়ে এল। রাঁধুনি সেগুলি বেশ ভালো করে রান্না করে এক-এক করে ঝুলিয়ে রাখল। রান্নার গন্ধে চারিদিক ম ম করছে। লোভে তখন কাকের মন উথালপাথাল। সে ভাবতে লাগল যে করেই হোক এগুলো খেতে হবে। সেই রাতে কাক অসুখের ভান করে পায়রাকে শুনিয়ে শুনিয়ে কাঁ কোঁ করতে লাগল।

পরদিন সকালে পায়রা বলল, চলো হে বেরিয়ে পড়ি। কাক বলল আমার খুব গা ব্যথা করছে। আজ আর আমি যাব না। অগত্যা পায়রা একাই চলে যায়। যাবার আগে ভালো করে বলে দিল, কোনো জিনিসে লোভ করবে না। কাক বলল, কিচ্ছু ভাববে না। আজ আমি উপোস করেই কাটাবো।

পায়রা চলে যাবার পর কাক ঝুড়ি থেকে মাথা বাড়িয়ে দেখে রাঁধুনি ঘরে নেই। তারপর চট করে উড়ে এসে মাংসের গামলার ওপর বসে। ঠোঁট দিয়ে যখনই মাংস তুলতে যাবে তখনই ঢাকনাটা ঝনঝন শব্দে পড়ে যায়। শব্দ পেয়েই ছুটে আসে রাঁধুনি। দেখে মনিবের জন্য রাঁধা মাংস কাক ঠোঁটে করে তুলছে। দেখেই রাগে তার মাথা চিড়বিড় করে ওঠে। তাড়াতাড়ি ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে ধরে ফেলে দুষ্টু কাককে। তারপর এক-একটা পালক উপড়ে নুন-লঙ্কা বেশ করে বেটে কাকের গায়ে মাখিয়ে গরম ঝোলে চুবিয়ে ঝুড়ির মধ্যে রেখে দেয়। ঝুড়ির মধ্যে যন্ত্রণায় কাক পরিত্রাহী ডাক ছাড়তে লাগল।

সন্ধ্যেবেলা পায়রা ফিরে এসে কাকের অবস্থা দেখে ভাবে, দুষ্কর্মের যোগ্য ফলই পেয়েছে কাক। এবার আর এখানে আমার থাকা উচিত নয়। এই ভেবে পায়রা রান্নাঘরের বাসা ছেড়ে চলে যায়। আর কাক মরে পড়ে থাকে ওই ঝুড়ির মধ্যে। পরদিন রাঁধুনি ঝুড়িসুদ্ধ কাককে বাইরে ফেলে দেয়। লোভের ফল কাক এভাবে হাতে হাতেই পেল।

(সংগৃহীত)

ভারতের বিপ্লবী

যতীন্দ্রনাথ দাস

বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ দাস ১৯০৪ সালের ২৭ অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২০ সালে ম্যাট্রিক পাশ করে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯২৩ সালে বিপ্লবী দলে যোগ দেন। ১৯২৪ সালে কলকাতায় 'তরুণ সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেন এবং গ্রেপ্তার হয়ে ঢাকা জেলে কারাবাস করেন। জেল কর্তৃপক্ষের অমানবিক আচরণের প্রতিবাদে ২৩ দিন অনশন করেন। ১৯২৯ সালে তাঁকে লাহোর জেলে পাঠানো হয়। এখানেও বন্দিদের ওপর জেল কর্তৃপক্ষের দুর্ব্যবহারের জন্য অনশন শুরু করেন। এই সময় বহুবার তাঁকে জোর করে খাওয়াবার চেষ্টা করা হয়। ৬৩ দিন অনশনের পর ১৯২৯ সালে ১৩ সেপ্টেম্বর তিনি মারা যান। এই বীর বলিদানীর মৃতদেহ কলকাতায় আনা হলে এক বিশাল মিছিল শোকযাত্রায় অনুগমন করে।

জানো কি?

- পুরীধামের রান্নাঘরে প্রতিদিন ৭৫২ টি উনুনে রান্না হয়।
- ৬০০ জন রাঁধুনির তত্ত্বাবধানে রান্না হয়।
- ১০০০ জন সহকারী সহযোগিতা করেন।
- এক-একটি উনানে হাঁড়ির ওপর হাঁড়ি ৯টি চাপানো হয়।
- একেবারে নীচের হাঁড়িটি গনগনে আগুনে চাপানো থাকলেও উপরের হাঁড়ির রান্না প্রথমেই হয়।
- রান্না মাটির হাঁড়িতে করা হয়। ধাতবপাত্র ব্যবহার করা হয় না।
- রান্নাঘরে বৈদ্যুতিক আলো নেই।

ভালো কথা

প্রজাপতি

আমাদের বাড়ির ছাদে বাবা চারটে বড়ো টবে চারটে লেবুর গাছ লাগিয়েছে। এখন গাছগুলি বেশ ঝাঁকড়া হয়েছে। সারা বছর লেবু ধরছে। বাবা প্রতিদিন সকালে গাছগুলির পরিচর্যা করে। এবারে একটা মজার ব্যাপার হয়েছে। অনেক প্রজাপতি গাছে গাছে উড়ছে, ছাদে উড়ে বেড়াচ্ছে। বাবা বলল লেবুগাছে প্রজাপতি ডিম দিয়েছে। আরও অনেক প্রজাপতি হবে। আমার খুব আনন্দ হচ্ছে যে এবার আমাদের ছাদ প্রজাপতিতে ভরে যাবে। এখনই প্রজাপতিগুলো বাবার গায়ে মাথায় বসে। বাবা বলল তুই এদের ভালোবাসলে তোরও গায়ে মাথায় বসবে।

শিঞ্জিতা রায়, নবম শ্রেণী, শিবমন্দির, শিলিগুড়ি।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে

(১) বা বা ড় ড়

(২) বি তা ধা গ্য

সঠিক ভাবে সাজাতে হবে

(১) হি হি তা ত ন ন্য জ্ঞা শূ

(২) হী ম্প ন হা স স দ য়

২৭ জুন সংখ্যার উত্তর

(১) জলতরঙ্গ (২) অবতরণ

২৭ জুন সংখ্যার উত্তর

(১) কথাসরিৎসাগর (২) শাকদিয়েমাছঢাকা

উত্তরদাতার নাম

(১) নবার্জুন সামন্ত, দ্বাবিকাচক, পূর্ব মেদিনীপুর (৩) শুভম সেন, মালদা, পুরুলিয়া
(২) সায়ন সামন্ত, দ্বাবিকাচক, পূর্ব মেদিনীপুর (৪) সঞ্জয় বাগ, বসিরহাট, উ: ২৪ পরগনা

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

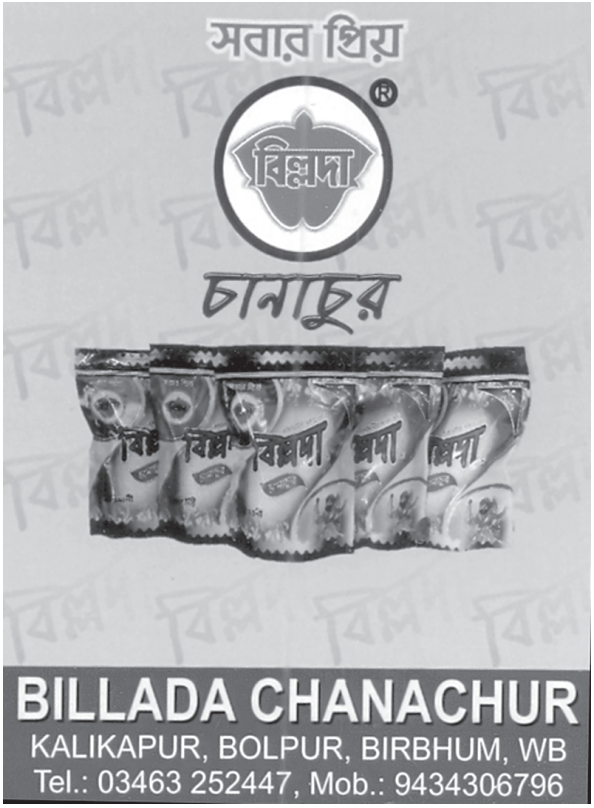

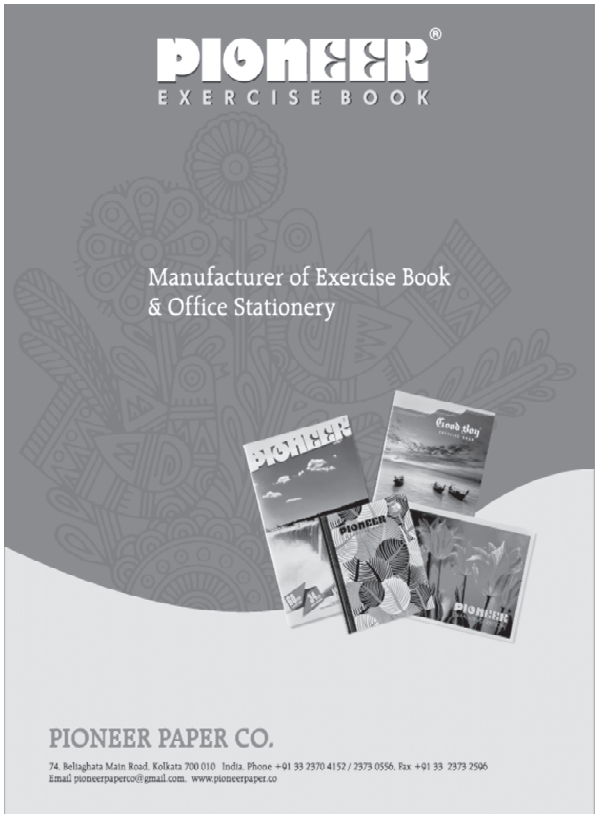

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের
ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

রাষ্ট্র জাগরণে সাধু-সন্ন্যাসীদের অবদান

করুণা প্রকাশ

ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিকতার দেশ, সাধু-সন্ন্যাসীদের দেশ। অনাদিকাল থেকে দেশে সাধুসন্তদের পরম্পরা চলে আসছে। বিশ্বে অনেক সভ্যতার উদয় হয়েছে। আবার বিলয়ও ঘটেছে। কিন্তু ভারতের সভ্যতা সংস্কৃতি আবহমানকাল ধরে প্রবহমান। এর এক বড়ো কারণ আমাদের দেশের সন্ন্যাসী পরম্পরা ও ধর্মধারিত সমাজ ব্যবস্থা। ধর্মের জ্ঞান সন্ন্যাসীদের থেকে সমাজ নিরন্তর পেয়ে এসেছে। এখানে কখনোই রাজসত্তা বা শাসন ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা ছিল না। ধর্ম ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা ছিল। ধর্ম ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় সাধু-সন্ন্যাসীদের এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

যখন আমাদের দেশে বিদেশি আক্রমণকারীদের শাসন কায়েম হলো এবং তার আগে ধর্মের নামে কর্মকাণ্ড, অহিংসা, জাতপাত, অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি কারণে অনেক সমস্যার সৃষ্টি হলো, তখনও আমাদের বিভিন্ন মত ও পন্থের সাধুসন্তরা প্রকৃত ধর্মের পথ দেখিয়ে সমাজ জাগরণের কাজ করেছেন। বিদেশি বিধর্মী আক্রমণকারীদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সমাজকে সংগঠিত করে লড়াই করার প্রেরণা দিয়েছেন। সে জন্যই আজও আমরা গর্বের সঙ্গে আমাদের পূর্বপুরুষদের শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতিকে জীবনের অঙ্গ করে চলেছি, যেখানে বিশ্বের বহু সভ্যতা মিশর রোম ইত্যাদির কোনো কিছু অবশিষ্ট নেই।

যখনই আমাদের ধর্মের উপর আঘাত এসেছে, সেই সংকটময় পরিস্থিতিতে আমাদের সাধু সন্ন্যাসীরা যোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁরা শুধু আধ্যাত্মিক জাগরণের কাজই করেননি, সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্র জাগরণের মহান ভূমিকা পালন করে দেশ, সমাজ, রাষ্ট্র ও ধর্মকে রক্ষা করার জন্য সমাজকে প্রেরণা দিয়েছেন। এই কাজে সমাজকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। রামচরিত মানসে গোস্বামী তুলসীদাস বলেছেন—

'জব জব হুই ধর্ম কী হানি, বারহি অসুর অধম অভিমানী,
তব তব ধরি প্রভু মনুজা শরীরা, হরহি কৃপানিধি সজ্জন পীড়া'।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

যদা যদা হি ধর্মস্য, গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদত্মানং সৃজম্যহম্।।
পরিত্রাণায় সাধূনাং, বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।

আসেতু হিমাচল সমগ্র ভারতবর্ষে আমরা এভাবেই সন্ত পরম্পরার প্রভাব দেখতে পাই।

আজ থেকে প্রায় ২৫০০ বছর আগে কেরলের কালাডি গ্রামে আদি শঙ্করাচার্যের আবির্ভাব হয়। সেই সময় দেশে ভগবান বুদ্ধের অনুগামীদের অহিংসার অপব্যাখ্যার কারণে সমাজে ক্ষাত্র তেজের প্রভাব কমে আসছিল। শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব ইত্যাদি উপাসনার মধ্যে মতবিরোধ শুরু হয়েছিল। তখন আদি শঙ্করাচার্য দক্ষিণ থেকে উত্তর, পূর্ব থেকে পশ্চিম ভারতের সর্বত্র পরিভ্রমণ করে সম্পূর্ণ ভারতকে একসূত্রে গ্রথিত করেন। এটা তাঁর দিগ্‌বিজয় যাত্রা ছিল। তিনি অদ্বৈত সিদ্ধান্ত মতের দ্বারা সম্পূর্ণ দেশে বৈদিক সনাতন পরম্পরার পুনঃস্থাপন করেন এবং তথাগত বুদ্ধকে নবম অবতার রূপে ঘোষণা করেন। বৈদিক ধর্মের সংস্কার সাধনে তিনি যুগান্তকারী কাজ করেছেন—

১. পঞ্চায়তন পূজার প্রচলন করে শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, গাণপত্য, সূর্য উপাসক সকলকে যুক্ত করেন।

২. দশনামী সন্ন্যাসী পরম্পরা শুরু করেন— গিরি, পুরী, ভারতী, বন, অরণ্য, আশ্রম, পর্বত, সাগর, সরস্বতী, তীর্থ।

৩. মহিলাদেরও ব্রহ্মজ্ঞান, বেদ পাঠের অধিকার দিয়েছেন।

৪. দেশের চার দিকে চার মঠ স্থাপন করে দেশকে একসূত্রে যুক্ত

ফঃ ৬

করেছেন।

৫. অদ্বৈতবাদী কিন্তু ভক্তি মার্গের কথাও বলেছেন।

৬. দেব-দেবীর বিষয়ে ভাবপূর্ণ স্তোত্র রচনা করেছেন— ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং। দেবী সুরেশ্বরী ভগবতী গঙ্গে।

৭. ১২ বছর বয়সে বেদের ভাষ্য রচনা করেন।

৮. ৩২ বছর বয়সের মধ্যে তিনি অসামান্য ও অদ্বিতীয় কার্য করেন।

৭১২ খ্রিস্টাব্দে ভারতে প্রথম ইসলামি আক্রমণ বিন কাসিমের দ্বারা হয়। ১১৯২-তে পৃথ্বীরাজ চৌহানের পরাজয়ের পর সারা দেশে ইসলামি আক্রমণ শুরু হয়। এরা সব জেহাদি আক্রমণকারী রূপে আসে। অমানবীয় অত্যাচার, নরসংহার, তরবারি দ্বারা হিন্দুর ধর্ম পরিবর্তন করা, মহিলাদের উপর অত্যাচার, গোহত্যা, মন্দির ধ্বংস— এইসব কুকীর্তি ইসলামি আক্রমণকারীরা সর্বত্র করতে থাকলো। তখন সেই অবস্থায় হিন্দুরাও নিচেষ্ট ভাবে বসে থাকেনি। হিন্দুরা ধর্মযুদ্ধ করেছে। কিন্তু ক্রূর ইসলামি অত্যাচারীরা অধর্ম ও কূটনীতির আশ্রয় নিয়ে হাজার হাজার মন্দির ও ধর্মস্থান ধ্বংস করে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করেছে। হিন্দু সমাজ ইসলামি আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য নানা প্রকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এগিয়ে এসেছেন নাথ সম্প্রদায়।

সর্বপ্রথম নাথযোগী মৎস্যেন্দ্র নাথ। পরে গোরক্ষনাথ, ভর্তৃহরি, গোপীচন্দ প্রমুখ ছিলেন। আদি শঙ্করাচার্যের পর হিন্দুধর্মের সম্মান রক্ষা, শ্রদ্ধা ও আস্থা বৃদ্ধির কাজ গুরু গোরক্ষনাথ সারা দেশে করেন। তিনি প্রথম মহাপুরুষ যিনি সারা দেশে হিন্দি ভাষার মাধ্যমে ধর্ম প্রচার করেন। ভারতের সব ভাষাতেই তাঁর সম্বন্ধে গল্প, কাহিনি পাওয়া যায়। জাতিগত ভেদভাবের ঊর্ধ্বে উঠে কাজ করেন। তাঁর ভক্ত শিষ্য সব জাতির ছিল। ইসলামি আতঙ্ক থেকে হিন্দু সমাজকে রক্ষা করার জন্য নাথ যোগীরা ঘরে ঘরে গিয়ে জাগরণের কাজ করতেন। 'অলখ' মানে ভগবান শ্রীরাম। কবিতা, কথা, প্রবচন, সংগীত, সারঙ্গী, ভৈরবী বাজিয়ে তাঁরা প্রচার করতেন। তন্ত্র, মন্ত্র, অলৌকিকতা, ধুনি, রোগমুক্তি ঔষধ দিয়ে মানুষের মনোবল জাগাতেন। পির ফকিরদের হাত থেকে হিন্দুদের বাঁচাতে এসব বিকল্প ব্যবস্থা শুরু করেন।

ইসলামি আক্রমণের সময়ে দশনামী সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরা 'আখড়া স্থাপনা করেন। শাস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে শস্ত্রবিদ্যার শিক্ষাও দেওয়া হতো। কাশীতে সন্ত মধুসূদন সরস্বতী সন্ন্যাসীদের শস্ত্র শিক্ষা দিতেন। যখন কাবুল থেকে যোধপুর পর্যন্ত ইসলামি আক্রমণ হয়েছিল তখন অটল আখড়ার সন্ন্যাসীরা লড়াইয়ে জেহাদিদের পরাজিত করেন। ১৬৬৪-তে ঔরঙ্গজেব যখন কাশী আক্রমণ করে তখন নির্বাণী আখড়ার সন্ন্যাসীরা লড়াই করে বিধর্মীদের পরাজিত করেন। ১৭৫১-তে আহমেদ খাঁ বঙ্গশ প্রয়াগ আক্রমণ করলে তখন নাগা সন্ন্যাসীরা গেরিলা পদ্ধতিতে লড়াই করে। ফলস্বরূপ আহমেদ খাঁ প্রয়াগ ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়। আহমেদ শাহ আবদালি গোকুল-মথুরা আক্রমণ করলে চার হাজার নাগা সন্ন্যাসী লড়াই করে মথুরা-বৃন্দাবন রক্ষা করেন। কিন্তু এই লড়াইয়ে ২ হাজার নাগা সন্ন্যাসীরও বলিদান হয়।

দশনামী সম্প্রদায় ছাড়াও বৈরাগীদের আখড়া ছিল। অযোধ্যা শ্রীরামজন্মভূমির জন্য রামানন্দ বৈরাগী আখড়ার সাধুরা নিরন্তর সংঘর্ষ করেছেন। ১৮৫৭ স্বাধীনতা সংগ্রামে বৈরাগী আখড়ার সন্ন্যাসীদের বড়ো রকমের যোগদান ছিল।

ভারতে প্রথম মুসলমান আক্রমণ সিন্ধুপ্রদেশে হয়। সেখানে প্রথম মুসলমান শাসন কায়েম হয়। দশম শতাব্দীতে সিন্ধুপ্রদেশে মরবরশাহ নামে মুসলমান শাসক হিন্দুদের উপর প্রচণ্ড অত্যাচার চালায়। হিন্দুরা সিন্ধু নদের তীরে ৪০ দিন ধরে বরুণদেবের পূজা অর্চনা করে হিন্দুদের রক্ষা করার প্রার্থনা করে। কথিত আছে, বরুণ দেবতা বসবপুরে রতনলালের ঘরে পুত্র রূপে জন্ম নেন, যার নাম হয় ঝুলেলাল। সন্ত ঝুলেলাল জনজাগরণ করেন, সংগঠন তৈরি করেন, পরে মরবরশাহের সঙ্গে যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে মরবরশাহ মারা যায়। সেখানে সন্ত ঝুলেলাল রাজা হন।

একাদশ শতাব্দীতে তামিলনাড়ুতে রামানুজাচার্যের আবির্ভাব হয়। ইনি রামানুজ সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। সামাজিক সমরসতার জন্য ঐতিহাসিক কাজ করেছেন। ব্রাহ্মণ চণ্ডাল সকলের জন্য উপাসনার পথ প্রশস্ত করেছেন। তাঁর গুরু গোষ্ঠপূর্ণ স্বামী 'ওঁম নমঃ নারায়ণায়' মন্ত্র দিয়েছিলেন যা তিনি পরবর্তী সময়ে হিন্দু সমুদায়ের জন্য দিয়ে যান। তাঁর জন্ম কাশীতে। ভগবান শ্রীরাম তাঁর আরাধ্য। সীতারাম উপাসনার কথা বলেছেন।

তিনি বলেছেন, 'জাতি পাতি পুছে না কোঈ, যো হরি কো ভজে সো হরি কা হোঈ'। তাঁর প্রধান শিষ্যদের মধ্যে সন্ত কবির, সন্ত রবিদাস, সন্ত পিপজী, ধন্নাজাট। তখন দেশে মুসলমান শাসকদের দ্বারা হিন্দুদের জোর করে ইসলামে ধর্মান্তরিত করা হতো। রামানন্দজী অযোধ্যার রাজা হরি সিংহের নেতৃত্বে ৪০ হাজার ধর্মান্তরিত রাজপুত হিন্দুধর্মে ফিরে আসে। রামানন্দজীর প্রভাবে তৎকালীন মুসলমান শাসক গিয়াসুদ্দিন জিজিয়া কর প্রত্যাহার, গোহত্যার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করতে বাধ্য হয়। তিনি সংস্কৃতের পণ্ডিত ছিলেন কিন্তু প্রচলিত হিন্দি ভাষাতে অনেক সাহিত্য রচনা করেন। তাঁর রচিত হনুমানজীর আরতি প্রসিদ্ধ— 'আরতি কিজে হনুমান লালা কি দুষ্টদলন রঘুনাথ কলা কি'। সম্পূর্ণ উত্তর ভারতে ভক্তি আন্দোলনের দ্বারা সমাজ জাগরণের ঐতিহাসিক কাজ স্বামী রামানন্দজী করেছেন।

ইসলামি আক্রমণের প্রতিকার অনেকাংশে সাধুসন্তদের আন্দোলনের দ্বারা সম্ভব হয়েছে। ভজন, সংকীর্তন, সৎসঙ্গ ইত্যাদির দ্বারা সম্পূর্ণ দেশ প্রভাবিত ছিল। এই বিরাট আন্দোলনের ফলস্বরূপ ইসলামিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে সমাজ সংগঠিত হয়ে তার প্রতিকার করেছে।

সাধিকা মীরাবাঈ, কম্বপাত্রা, লললেশ্বরী (কাশ্মীর), অণ্ডাল (তামিলনাড়ু) প্রমুখ মহিলা সন্ত ভক্তি পরম্পরার সন্ন্যাসী। গোস্বামী তুলসীদাস বাল্মীকি রামায়ণের হিন্দি অনুবাদ রামচরিত মানস লেখেন। সন্ত জ্ঞানেশ্বর মহারাষ্ট্রে গীতার মারাঠি অনুবাদ ও জ্ঞানেশ্বরী রচনা করেন শংকরদেব। কৃত্তিবাস ওঝা বাংলায় রামায়ণ অনুবাদ করেন। অসমের অসমীয় ভাষাতে শ্রীমদ ভগবতের অনুবাদ করেন মালায়মে অধ্যাত্ম রামায়ণ এবং তালিম ভাষায় কম্ব রামায়ণ রচিত হয়।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, গুরু নানকদেব, গুরু অর্জুনদেব, সন্ত একনাথ, সন্ত কবির, সন্ত রবিদাস প্রমুখ সন্ন্যাসী বিধর্মী শাসকদের বিরুদ্ধে ভক্তি আন্দোলনের দ্বারা সমাজে জাগরণ এনে ধর্ম সংস্থাপনের কাজ করেছেন।

ব্রজভূমিতে কৃষ্ণভক্তির সঞ্চার করেন বল্লভাচার্য। প্রধান শিষ্য

কুম্ভনদাসের কীর্তি শুনে আকবর তাকে ফতেপুর সিক্রির দরবারে হাজির হতে আদেশ দেয়। আকবরের দরবারে হাজির হয়ে নির্ভীকতার সঙ্গে বলেন— 'ভক্তনক কা শিকারি সো কাম। আবত-জাবত পন্থুয়া টুটি বিসরি গয়া হরিনাম। জাগো মুখ দেখি অধ লগি তোক করনি পরি পরনাম। কুম্ভনদাস লাল গিরিধর বিন য়হ সব ধাম।।

রাজস্থানে সন্ত ধন্নাজী, সন্ত পিপাজী, বাবা রামদেব (পোখরান) সিদ্ধ যোগী, প্রসিদ্ধ চিকিৎসক এবং কুশল যোদ্ধা ছিলেন। ধর্মান্তরিত হিন্দুদের স্বধর্মে ফিরিয়ে আনার কাজ করেছেন। হাজার হাজার ধর্মত্যাগী হিন্দুকে আবার হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে আনেন।

গুজরাটের সন্ত নরসী মেহতা— 'বৈষ্ণবজন তো তেনে কহিয়ে, পীর পরে লাগে রে'— রচনা করেন। জাতপাত ভেদভাব দূর করার কাজ করেছেন। স্বামীনারায়ণ সম্প্রদায়ের স্বামী মোহনদাসজী এবং জামনগরের প্রণামী সম্প্রদায়ের স্বামী প্রাণাথজী ভক্তি আন্দোলনের জোয়ার আনেন।

মহারাষ্ট্র বারকরী সম্প্রদায়ের সন্ত জ্ঞানেশ্বর লেখেন, গীতার মারাঠি অনুবাদ জ্ঞানেশ্বরী, যা মহারাষ্ট্রের ঘরে ঘরে সমাদৃত। ২১ বছর বয়সে জীবন্ত সমাধি নেন।

সন্ত নামদেবজী কীর্তন পরম্পরার সন্ত প্রসিদ্ধ। ২০ বছর পঞ্জাবে ভক্তি পরম্পরা প্রচার করেন।

সন্ত তুকারামজী— হাজার হাজার ভজনের রচয়িতা।

সন্ত একনাথজী— ভাবার্থ রামায়ণের রচয়িতা। পিতার শ্রাদ্ধে হরিজন বন্ধুদের ভোজন করান।

সমর্থ গুরু রামদাস একজন বিখ্যাত সন্ত। তাঁর আরাধ্য প্রভু শ্রীরাম। দাসবোধ গ্রন্থের রচয়িতা। ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের গুরু। রাষ্ট্র জাগরণের মহান কার্য সাধন করেছেন।

সন্ত বসবেশ্বর সামাজিক সমরসতার কাজ করেছেন। বাল্যবিবাহের বিরোধিতা এবং বিধবা বিবাহের প্রচলন করেছেন।

স্বামী বিদ্যারণ্যজী মুসলমান আক্রমণের বিরুদ্ধে জনজাগরণের কাজ করেছেন। মুসলমান যুবকদের হিন্দুধর্মে ফিরিয়ে আনেন। হরিহর ও বুক্কাকে দিয়ে ১৯৩৬-এ বিজয়নগর সাম্রাজ্যের স্থাপনা করেন। বিজয়নগর তৎকালীন ভারতের স্বতন্ত্র হিন্দু রাজ্য।

সন্ত কনকদাস বিজয়নগর সাম্রাজ্যের সেনানায়ক ছিলেন। তিনি গড়রিয়া সম্প্রদায়ের ছিলেন। উদুপী মন্দির দর্শনে গেলে তাকে বাধা দেওয়া হয়। তথাকথিত পিছিয়ে পড়া সমাজের হওয়ার জন্য মুখ্য মন্দিরে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। কনকদাস তখন মন্দিরের পিছনে গিয়ে ভগবানের নামগান করতে থাকেন এবং তখন প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি শুরু হয়ে যায় এবং মন্দিরের দেওয়াল ভেঙে যায়। দেখা যায়, মন্দিরের শ্রীকৃষ্ণ মূর্তি সম্পূর্ণ পিছন দিকে ঘুরে রয়েছে এবং কনকদাস কীর্তন করে চলেছেন। বর্তমানে উদুপি মন্দিরে সেই স্থান এখনও সেইরকমই আছে। লোকেরা তাকে কনকন দিণ্ডি বলে।

অন্ধ্রপ্রদেশ : সন্ত অন্নামাচার্যালু তিরুপতি বালাজীর ভক্ত ছিলেন। কয়েক হাজার ভজন তেলুগু ভাষায় লিখেছেন। তাছাড়াও সন্ত বেমনা, বীর ব্রহ্মেন্দ্র স্বামী, সন্ত কাক্কায়া প্রমুখ ছিলেন।

তামিলনাড়ু : প্রায় এক হাজার বছর পূর্বে সন্ত তিরুবল্লুবর আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিরুকুরম গ্রন্থ রচনা করেন যা ভারতীয় ভাষায় শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। বৈষ্ণব মহিলা সন্ত ভক্ত অণ্ডাল। শৈব পরম্পরার সন্ত অনবার, সন্ত নন্দনার। সন্ত কম্বন তামিল ভাষায় রামায়ণ লেখেন যা কম্ব রামায়ণ নাম প্রসিদ্ধ।

কেরলের মহাকবি এজুত্বছন দ্বারা লিখিত আধ্যাত্ম রামায়ণ করলে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। শ্রী নারায়ণ গুরু কেরলের শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ এবং শ্রেষ্ঠ সমাজ সংস্কারক। এছাড়াও মাতা অমৃতানন্দময়ী মা অন্যতম।

বাঙ্গলার কবি জয়দেব গীতগোবিন্দের রচয়িতা। দশবতার স্তোত্র তার লেখা কাব্য আজও সমাদৃত। শূদ্রমুনি সন্ত সারল দাস ওড়িয়া মহাভারত রচনা করেন।

বঙ্গপ্রদেশে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বৈষ্ণব পরম্পরার মহান সন্ন্যাসী। উচ্চ নীত-ভেদাভেদ-অস্পৃশ্যতা নির্মূল করে সকলকে হরিনামের মাধ্যমে একত্র করেছিলেন। পরাবর্তন করে ধর্মান্তরিতদের হিন্দু সমাজে ফিরিয়ে নেওয়ার প্রথা প্রচলন করেছিলেন। অত্যাচারী শাসক চাঁদ কাজীকে নতজানু হতে বাধ্য করেন। সমাজকে অনেক গোঁড়ামি কুসংস্কার থেকে মুক্ত করেন।

এছাড়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব একজন মহান সমাজ সংস্কারক। তাঁর শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্ববরেণ্য সন্ন্যাসী। হিন্দুধর্মের বিজয় পতাকা দেশে তথা বিদেশে উড্ডীন করেন। হিন্দু ধর্মের গৌরব বৃদ্ধি করেন। জাতির জীবনে রাষ্ট্রীয়তার বীজ বপন করেন। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রেরণা স্বরূপ ছিলেন। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ। হিন্দুদের মধ্যে ক্ষেত্র তেজ জাগ্রত করেন। যুবকদের শক্তিশালী ও সংগঠিত হওয়ার প্রেরণা স্বরূপ ছিলেন।

পঞ্জাবে শিখ পন্থের প্রবর্তক শ্রীগুরু নানকদেবজী।

গুরু অর্জুনদেবজী অমৃতসর স্বর্ণমন্দির এবং গুরু গ্রন্থসাহিবের প্রতিস্থাপন।

মহান বলিদানি সন্ত গুরু তেগবাহাদুরকে হিন্দ কী চাদর বলা হয় তাঁকে।

নবম শিখগুরু গুরুগোবিন্দ সিংহ ধর্মের জন্য সর্বস্ব বলিদান দিয়েছে। ধর্মের জন্য চার পুত্রকে বলিদান করেছেন।

গুরু গোবিন্দ সিংহের শিষ্য, মহান যোদ্ধা ও সন্ত বীর বন্দাবৈরাগী— গুরুপুত্রের হত্যাকারীদের শাস্তিদাতা, ধর্ম সংস্থাপক, মুসমানদের কবল থেকে হিন্দুদের মুক্ত করেন। আর্য্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী— মহান সমাজ সংস্কারক। বেদের প্রচার ও প্রসার করেন। শুদ্ধি আন্দোলনের অন্যতম সূত্রধর।

এরূপ আরও অনেক মহান সন্ন্যাসীরা আমাদের ধর্ম সংস্কৃতি রক্ষার জন্য কাজ করেছেন। ভক্তি আন্দোলনের মাধ্যমে মুসলমান অত্যাচারের বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল সমাজকে সংঘর্ষ করার প্রেরণা দিয়ে এসেছেন এরকম অনেক পূজ্য সন্তদের কথা এখনও আমাদের অজানা রয়ে গেছে। এই সন্ন্যাসীদের প্রেরণায় ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ, রাণা প্রতাপ, শ্রীকৃষ্ণদেব রায় নতুন ইতিহাস গড়েছেন যা আমাদের গর্ব এবং বিশ্বের বিস্ময়। ঠিক সেই রকমই ইংরেজ আমলে স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী, ঋষি অরবিন্দ, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ মহাপুরুষ ধর্ম সংস্কৃতি রক্ষার কাজ করেন। সমাজ জাগরণের জন্য শ্রেষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। স্বাধীনতার ৭৫ বছরে এই সকল মহা জীবনকে শতকোটি প্রণাম। □

কড়াহাতে দেশের উগ্রপন্থা নির্মূল করার সময় এসেছে

মণীন্দ্রনাথ সাহা

আন্তর্জাতিক জেহাদি জঙ্গি সংগঠন বহুদিন ধরে ভারতে অস্থিরতা তৈরির চেষ্টা করে চলেছে। তার ওপর দেশের ভেতরের কিছু রাজনৈতিক দলের প্রশ্রয়ে এবং বিভিন্ন এলাকায় স্থানীয় জিহাদিদের আশ্রয়ে জঙ্গি গোষ্ঠীগুলো আস্তানা গাড়ার সুযোগ পেয়ে দেশে ব্যাপকভাবে অস্থিরতা সৃষ্টির চেষ্টা চালাচ্ছে। এই অপরাধীদের বিরুদ্ধে যদি কোথাও কোনো সরকার কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং কেন্দ্র সরকার দেশের সুরক্ষার জন্য কঠিন কোনো নিয়ম প্রবর্তন করে তখন দেশ তথা এই পশ্চিমবঙ্গের তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিক এবং তথাকথিত বিদ্বজনেরা কেন্দ্র সরকারের প্রতি অশালীন মন্তব্য করে উগ্রপন্থাকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করতে থাকেন। ফলত দেশের বাইরের অর্থ, অস্ত্র এবং ভেতরের পূর্ণ সমর্থন পেয়ে নাশকতা বা হিন্দুহত্যা সুচারু ভাবে করে থাকে।

তারই ফলশ্রুতিতে সাম্প্রতিক বিতর্কিত মন্তব্যের জন্য বিজেপি থেকে সাসপেন্ড হওয়া মুখপাত্র নূপুর শর্মার সমর্থনে সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করায় ভারত ও বাংলাদেশে দুটি মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে গেছে। সেই নির্মম বর্বরতা সভ্য সমাজে কখনই মেনে নেওয়া যায় না।

ভারতে রাজস্থানের উদয়পুরের দর্জি কানহাইয়ালালকে নির্মমভাবে খুন করে সেই ভিডিয়ো সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে বাংলাদেশের নড়াইলের মির্জাপুর ইউনাইটেড ডিগ্রি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ স্বপনকুমার বিশ্বাসের গলায় জুতোর মালা পরিয়ে দেওয়া হয়েছে, যার সঙ্গে সামাজিক মাধ্যমে ওই পোস্টের কোনও সম্পর্ক নেই। তবে দু'দেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ ধর্মীয় উন্মাদনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন। রাজস্থানের ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে দেশের বিভিন্ন মহল এবং বাংলাদেশে নড়াইলের ঘটনারও ধিক্কার জানিয়েছেন সে দেশের মানুষ। এটা অবশ্যই শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের ভালো দিক।

পাকিস্তান ও বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের যেরকম সংগঠিত ভাবে নির্যাতন, হত্যা করা হয় তা বর্তমান সময়ে অসভ্যতা ও বর্বরতাকেও হার মানায়। নড়াইলের মির্জাপুর ইউনাইটেড ডিগ্রি কলেজের এক হিন্দু ছাত্রের বিরুদ্ধে সামাজিক মাধ্যমে নূপুর শর্মার সমর্থনে পোস্ট করার অভিযোগ ওঠায় কলেজের অধ্যক্ষ স্বপনকুমার বিশ্বাস আইন মেনে তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য থানায় ফোন করেছিলেন। কিন্তু উত্তেজিত জনতা ও মুসলমান ছাত্ররা তাকে তাদের হাতে তুলে দেওয়ার দাবি জানাতে থাকে। কিন্তু গুজব রটে যায়— অধ্যক্ষ ওই ছাত্রের পক্ষ নিয়েছেন। তখনই তাঁকে জুতোর মালা পরিয়ে দেওয়ার ফতোয়া দেওয়া হয় এবং পুলিশের সামনেই তা কার্যকর করা হয় বলে জানা গিয়েছে।

স্বপনবাবু এখন লজ্জায় মুখ দেখাতে পারছেন না। শুধু এই একটি ঘটনাই নয়, বাংলাদেশে শিক্ষক-সহ সংখ্যালঘু অন্যদের ওপর হামলার একাধিক ঘটনা ঘটেছে। সাভারের হাজি ইউনিস আলি স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষক উৎপল কুমার সরকারকে পিটিয়ে হত্যা করেছে সেই স্কুলের দশম শ্রেণীর এক জেহাদি ছাত্র। প্রায় দু'মাস আগে মুন্সিগঞ্জের শিক্ষক নারায়ণ চন্দ্র মণ্ডলকে ধর্মীয় অপবাদ দিয়ে জেলে পাঠানো হয়। ধর্মীয় অবমাননার অভিযোগ তুলে নারায়ণগঞ্জের এক প্রধান শিক্ষককে কান ধরে উঠবোস করানো হয়েছে। আর পাকিস্তানে তো হিন্দুর 'ছায়া' মুসলমানদের গায়ে পড়লেই হিন্দু হত্যার অধিকার জন্মায়।

এ-তো গেল বাংলাদেশ-পাকিস্তানের কথা। এবারে দেখে নেওয়া যাক ভারতে হিন্দুদের পরিণতি কোনদিকে এগোচ্ছে। ইতিপূর্বে এদেশে রামনবমী, হনুমান জয়ন্তীর শোভাযাত্রা ঘিরে দেশের কয়েকটি শহরে ধর্মীয় বিদ্বেষ তৈরি হয়েছিল এবং কিছু অপ্রীতিকর ঘটনাও ঘটেছিল। এরই মধ্যে টিভিতে একটি বিতর্ক সূত্রে পয়গম্বরকে নিয়ে বিজেপির মুখপাত্র নূপুর শর্মার মন্তব্য ঘিরে বিভিন্ন স্থানে মুসলমান সম্প্রদায়ের কিছু লোক ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটায়। এমনকী বিভিন্ন ইসলামি দেশও ওই মন্তব্যের বিরুদ্ধে কড়া প্রতিক্রিয়া দেয়। এই পরিস্থিতিতে ভারত সরকার পরিষ্কার বলে দেয়— 'তারা ওই মন্তব্যকে সমর্থন করে না। তারা সমস্ত ধর্মকে শ্রদ্ধা করে।' বিজেপিও নূপুর শর্মার ওই মন্তব্যে সায় দেয়নি। সেজন্য দল তাকে সাসপেন্ড করেছে।

নূপুর শর্মার সমর্থনে সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করায় যেভাবে রাজস্থানের উদয়পুরের দর্জি কানহাইয়ালালকে হত্যা করে তার ভিডিয়ো ভাইরাল করা হয়েছে তা কিন্তু শুভ সংকেত দেয় না। জনাকীর্ণ বাজারে পোশাকের

জন্য শরীরের মাপ নেওয়ার সময় দর্জিকে নির্মমভাবে খুন করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। অন্যজন হাসিমুখে তার ভিডিয়ো বানিয়ে সেই ভিডিয়ো সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, আততায়ীরা এতটাই বেপরোয়া যে, তারা প্রধানমন্ত্রীকেও হুমকি দিয়েছে। এর পিছনে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর হাত থাকতে পারে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। এনআইএ এর তদন্তে নেমেছে। কেননা নূপুর শর্মার মন্তব্যের জেরে আলকায়দা, আইএস-এর মতো আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠন ভারতে হামলা চালানোর হুমকি দিয়েছে।

উদয়পুরের ঘটনায় যাতে নতুন করে হিংসা বা উত্তেজনা না ছড়ায় তার জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আবেদন করেছেন। সেই সঙ্গে ঘটনার তীব্র নিন্দা করে টুইট বার্তায় জানিয়েছেন--- 'হিংসা ও উগ্রপন্থাকে কোনও ভাবেই সমর্থন করা যায় না। উদয়পুরে যে ঘটনা ঘটেছে, তার তীব্র নিন্দা করছি। আইন যা করার করবে। আমি সবাইকে শান্তি বজায় রাখার আবেদন জানাচ্ছি।'

রাহুল গান্ধীও ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন। তিনি টুইট বার্তায় জানিয়েছেন— 'এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডে আমি স্তম্ভিত। ধর্মের নামে বর্বরতাকে মেনে নেওয়া যায় না। যারা এভাবে সন্ত্রাস ছড়িয়েছে তাদের দ্রুত শাস্তি দিতে হবে। আমাদের সবাইকে একজোট হয়ে ঘৃণাকে হারাতে হবে। সবার কাছে শান্তি ও সৌভ্রাতৃত্ব বজায় রাখার আবেদন জানাচ্ছি।'

একইভাবে ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। তিনি টুইটে লিখেছেন--- 'উদয়পুরের ঘটনা ভয়াবহ ও বীভৎস। এই নৃশংসতার কোনও স্থান নেই সভ্যজগতে। ঘটনার তীব্র নিন্দা করছি। সেইসঙ্গে অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তির দাবি করছি।'

ঘটনার পরেই দুই যুবককে গ্রেপ্তার করেছে রাজস্থান পুলিশ। মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট ঘটনাটিকে 'অত্যন্ত দুঃখজনক' ও 'লজ্জাজনক' বলে উল্লেখ করেছেন। এমনকী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে রাজ্যে একমাসের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করার পাশাপাশি ২৪ ঘণ্টার জন্য ইন্টারনেট পরিষেবা সম্পূর্ণ বন্ধ রাখা হয়েছিল।

ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন আজমের শরিফের প্রধান আজমের দরগা দিওয়ান জয়নুল আবেদিন আলি খান। তিনি বলেছেন— 'ভারতীয় মুসলমানরা কখনই তালিবানি মনোভাব সমর্থন করে না।' সব মিলিয়ে উদয়পুরের ঘটনা নিয়ে যাতে দেশজুড়ে অপ্রীতিকর পরিস্থিতি না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে প্রশাসন।

দেশের শান্তিপ্রিয় মানুষদের এখন ভাবার সময় এসেছে যে বায়বীয় ধর্মের দোহাই দিয়ে কেউ যদি উগ্রপন্থা প্রবর্তন করার চেষ্টা করে তবে দলমত নির্বিশেষে একমত হয়ে তা রুখে দিতে হবে। আর মনে রাখতে হবে রাজনৈতিক মতবাদ যাই হোক না কেন, নিজের ক্ষতি কিন্তু কোনও রাজনৈতিক দল বা সংগঠন পুষিয়ে দেবে না। □

কানহাইয়ালালের শেষযাত্রায় হাজার হাজার মানুষের অংশগ্রহণ।

শোকসংবাদ

উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ নগরের শিবাজী শাখার স্বয়ংসেবক অজিত পণ্ডিত সকলের প্রিয় ভগবানদা গত ২৯ জুন পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। তিনি স্বাস্থ্য বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী ছিলেন। ১৯৮৯-৯০ সালে সঙ্ঘের সংস্পর্শে আসেন। দ্বিতীয় বর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ সম্পন্ন করেন। একজন নিষ্ঠাবান স্বয়ংসেবক হিসেবে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি অযোধ্যায় করসেবক হিসেবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি প্রতিনিয়ত শরীরচর্চা করতেন। রাজ্য তথা অখিল ভারতীয় স্তরে বহু পুরস্কার জিতেছেন। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ২ পুত্র, ১ কন্যা, ২ নাতি-নাতনি ও আত্মীয়স্বজন রেখে গেছেন।

কানহাইয়ালাল হত্যার প্রতিবাদে উত্তরবঙ্গে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বিক্ষোভ সমাবেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি।। ধর্মীয় নাশকতা ছড়িয়ে সম্প্রতি রাজস্থানের উদয়পুরে কানহাইয়ালাল নামে এক হিন্দু দর্জিকে নৃশংসভাবে হত্যা করে দু'জন জেহাদি। তার প্রতিবাদে গত ৩০ জুলাই উত্তরবঙ্গ জুড়ে বিক্ষোভ সমাবেশে উপস্থিত হয় সাধারণ মানুষ। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং বজরঙ্গ দলের নেতৃত্বে সংগঠিত এই বিক্ষোভ সমাবেশে অপরাধীদের কুশপুত্তলিকা পোড়ানো হয়। সমাবেশ স্থল থেকে মাতৃশক্তি, দুর্গাবাহিনীও দোষীদের শাস্তির দাবি তোলে।

সমস্ত জায়গায় বিক্ষোভকারীরা দ্রুত বিচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দোষীদের বিচার এবং কানহাইয়ালালের খুনিদের মৃত্যুদণ্ডের দাবি জানায়। সেইসঙ্গে নিহত কানহাইয়ালালের পরিবারকে এক কোটি টাকা আর্থিক সহায়তা এবং পরিবারের একজনকে সরকারি চাকরি দেওয়ার দাবি জানানো হয়। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সহ সম্পাদক ও প্রান্ত প্রচার প্রসার প্রমুখ লোকেশ্বর মহন্ত বলেন, "এই ধরনের জেহাদি ও সন্ত্রাসীদের সুরক্ষা প্রদানকারী সংস্থাগুলিকে ভারতে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র রাজ্য সরকার নয়, কেন্দ্র সরকারকেও তৎপরতা দেখাতে হবে।"

প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগে নূপুর শর্মার মন্তব্যের সমর্থন জানিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছিলেন কানহাইয়ালাল। সেই কারণেই জেহাদিদের হাতে খুন হতে হয় তাঁর বাবাকে। এই ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে পড়ে হিন্দু সমাজ। দেশজুড়ে চলে প্রতিবাদ। এদেশের হিন্দু সমাজ বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতৃত্বে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিক্ষোভ মিছিলে অংশগ্রহণ করে। এই কর্মসূচির অংশ হিসেবেই উত্তরবঙ্গে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজরঙ্গ দলের প্রান্ত ও বিভিন্ন জেলার কার্যকর্তা দের সঙ্গে হিন্দুরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এসে বিক্ষোভ প্রদর্শনে শামিল হয়।

উত্তরবঙ্গে মোট ১১টি জেলায় এই কর্মসূচি পালন করা হয়। প্রায় ১ হাজার কার্যকর্তাকে এদিন সক্রিয় ভূমিকা নিতে দেখা যায়। প্রায় সমস্ত জেলাতেই পুলিশ প্রশাসন বিক্ষোভ মিছিলে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে। শিলিগুড়িতে কর্মসূচি চলাকালীন ৬ জন কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার জেরে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজরঙ্গ দলের দেড়শো'র বেশি কর্মী থানা ঘেরাও করে। আলিপুরদুয়ারে বিক্ষোভ মিছিলে প্রায় ৪৫০ জন কার্যকর্তা অংশগ্রহণ করেছিলেন।

জ্বালানি তেলের বিক্রি বাড়লো ভারতে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভারতে পেট্রোল, ডিজেলের বিক্রি প্রাক- করোনা পর্যায়কেও ছাপিয়ে গেল। গত জুন মাসে ভারতে মোট ৩৭ লক্ষ ৮০ হাজার টন ডিজেল বিক্রি হয়েছে, যা গত বছরের তুলনায় ৩৫.২ শতাংশ বেশি। এদেশে কোভিড হানার আগে ২০১৯ সালের জুন মাসের তুলনায় ডিজেল বিক্রি বেড়েছে ১০.৫ শতাংশ। ভারতে করোনার তৃতীয় ঢেউয়ের প্রকোপ কমে, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড প্রায় স্বাভাবিক হওয়ার সঙ্গে; চাষের মরশুম শুরু হওয়ায় ডিজেলের বিক্রি রেকর্ড বৃদ্ধি পেয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। পাশাপাশি, গত মাসে ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত তেল বিপনণকারী সংস্থাগুলি মোট ২৮ লক্ষ টন পেট্রোল বিক্রি করেছে। যা গত বছরের মরশুমের তুলনায় ২৯ শতাংশ বেশি।

রেকর্ড সামুদ্রিক খাদ্যপণ্য রপ্তানি ভারতের

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কোভিড অতিমারী পরিস্থিতিতেও ভারত ২০২০-২১ অর্থবর্ষে বিদেশের বাজারে ৪৩,৭১২.২৬ কোটি টাকা মূল্যের ১১,৪৯,৩৪১ মেট্রিক টন সামুদ্রিক খাদ্যপণ্য রপ্তানি করেছে। ভারতের প্রেস ইনফর্মেশন ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী আমেরিকা, চীন ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রথম সারির দেশগুলি ভারত থেকে এই সামুদ্রিক খাদ্যপণ্য কিনেছে। মূলত হিমঘর জাত চিংড়ি, মাছ ইত্যাদি রপ্তানি করেছে ভারত।

সামুদ্রিক পণ্য রপ্তানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান কে এস শ্রীনিবাস জানিয়েছেন, করোনা সংক্রমণকালে শুরুর দিকে সী-ফুড রপ্তানি ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব পড়েছিল। তবে, ২০২০-২১ অর্থবর্ষের শেষ ত্রৈমাসিকে এই ক্ষেত্রে রপ্তানির হার পুনরায় বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভারত বিদেশে সী-ফুড রপ্তানি করে মোট যে পরিমাণ অর্থ আয় করেছে, তার মধ্যে ৫১.৩৬ শতাংশ অর্থ এসেছে হিমঘর জাত চিংড়ি রপ্তানি করে। ভারত থেকে সবচেয়ে বেশি চিংড়ি আমদানি করেছে আমেরিকা। এরপর রয়েছে চীন, ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্যভুক্ত জাপান, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো। ভারতের রপ্তানি করা মোট সামুদ্রিক পণ্যের মধ্যে ১৬.৩৭ শতাংশ হলো হিমঘরজাত মাছ। এর ফলে ভারতের মোট আয়ের ৬.৭৫ শতাংশ এসেছে হিমঘরজাত মাছ ও রপ্তানি করে।

পশ্চিমবঙ্গবাসীর সমর্থন চেয়ে কলকাতায় দ্রৌপদী মুর্মু

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ এনডিএ সমর্থিত রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী দ্রৌপদী মুর্মু পশ্চিমবঙ্গবাসীর সমর্থন চাইতে গত ৯ জুলাই কলকাতায় এসেছিলেন। ওইদিন তিনি রাজ্য বিধান সভায় বিধায়কদের কাছে ভোট প্রার্থনা করেন। বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ শিবিরের রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী দ্রৌপদী মুর্মু ভারতের সাঁওতাল জনজাতি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন রাজ্যপাল দ্রৌপদী সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট অভিজ্ঞ। অন্যদিকে বিরোধী জোটের মনোনীত যশবন্ত সিন্‌হা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী আমলের বিদেশ ও অর্থমন্ত্রী। ২০২১ সালে দলবদল করে তৃণমূলে যান যশবন্ত।

মনোনয়ন পত্র পেশ করার পর পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফোন করে সমর্থন চান দ্রৌপদী। মমতাও তাঁকে শুভেচ্ছা জানান। কিন্তু তিনি যশবন্তকে ভোট দেওয়া স্থির করেন। যদিও পরে তিনি কার্যত স্বীকার করেন যে দ্রৌপদী মুর্মুর জয়ের সম্ভাবনা বেশি। এমনকী বিজেপি দ্রৌপদী মুর্মুর নাম মনোনীত করবে জানতে পারলে বিরোধী জোটের পক্ষ থেকে কোনো প্রার্থী দেওয়া হতো না বলেও জানান তিনি। এই পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের আগে শহরে দ্রৌপদী মুর্মুর উপস্থিতি এক অন্যমাত্রা যোগ করেছে বলে ধারণা রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের।

।। চিত্রকথা ।। মহামানব মহানামব্রত ।। ৬ ।।

প্রথমে পাঠশালায় পড়াশোনা। তারপর সেখান থেকে স্কুলে যাতায়াত শুরু হলো।

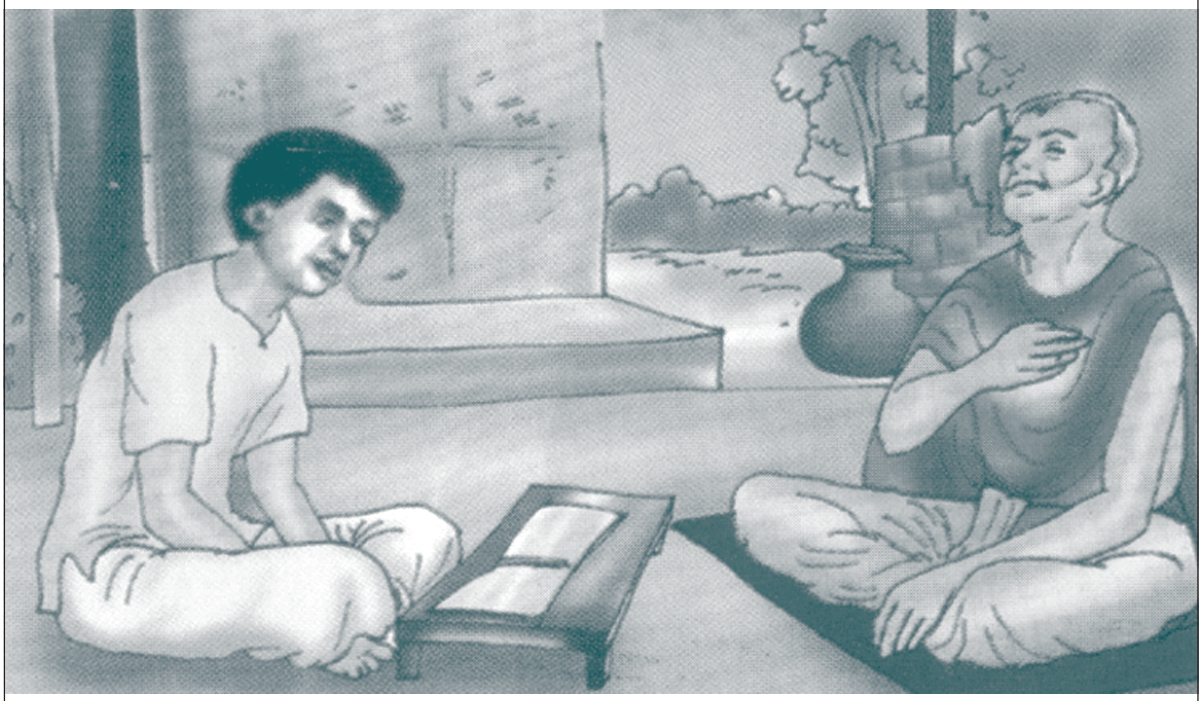

বঙ্কিম বড়ো হতে লাগলেন। এদিকে কালিদাস ক্রমে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে অন্ধ হয়ে গেলেন। কানেও ভালো শুনতে পেতেন না। বঙ্কিমই বাবার সেবা করতে লাগলেন। বাবাকে রামায়ণ-মহাভারত পড়ে শোনাতেন তিনি। (ক্রমশ)